# আকাশ-পাতাল

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মূল্য বারো আনা

প্রকাশক

[illegible] মার মিত্র

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

১২, নারিকেল বাগান লেন,

কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ

**লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ**

১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

# দু' একটি কথা

গ্রন্থখানি ছেলেদের জন্য রচিত। যে বিষয়গুলি তাদের কাছে উপস্থিত করেছি সেগুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। এরোপ্লেনের জন্ম বেশীদিন হয় নি, তার জীবন কদিনের বা? বাংলার এক সীমানায় তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্র, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ক'জনের? মাটির নীচে, মরুভূমির মধ্যেও নানা রত্নের সন্ধানে মানুষ কত অসমসাহসিক কাজ করছে। এই গ্রন্থে আমি গল্পচ্ছলে সে সবের আভাষ দিয়েছি মাত্র। গ্রন্থখানি যদি আমার পাঠকগণের মনে রেখাপাত করে, তাহলেই শ্রম সফল জ্ঞান করব।

গ্রন্থকার

কলিকাতা
আষাঢ়,
১৩৪১

# উৎসর্গ

শ্রীমান্ গৌরকে

উপহার

যাত্রীবহনকারী প্লেন।

কলম্বো শহরে সমুদ্রের ধারে একটি হোটেলে এক সন্ধ্যায় চারটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। লোক চারটি বড় মজার। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি চারটি গল্প শুনি। গল্পগুলির মধ্যকার লোমহর্ষক ঘটনাগুলো আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—কেবল মনে পড়ে। তোমাদের সেগুলো একে একে বল্‌ব। তার আগে লোকগুলোর নাম শুনে রাখ। তাদের একজনের নাম বিজয়, দ্বিতীয় জনের নাম প্রতাপ, তৃতীয় লোকটি মোহন, চতুর্থটির নাম সামন্ত। এরা সকলেই বেশ চট্‌পটে, বলিষ্ঠ ও সাহসী, কিন্তু কথা কিছু কম কয়। বিজয়ই প্রথমে বল্‌তে স্থরু করলে—

# বিজয়ের গল্প

'আমি কোথায় ঘুরি জানেন? ঐ আকাশে। তাই বলে তারার রাজ্যে পৌঁছতে পারি না; তারাগুলোর একটারও নাগাল পাই না। কিন্তু মেঘের রাজ্য পার হয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে, সাগর পেরিয়ে, সুদীর্ঘ বনের ওপর দিয়ে দেশ-দেশান্তরে চলে যাই। তবে ইচ্ছা আছে, একদিন তারাদের কোন একটাতে না যেতে পারলেও চাঁদের দেশে যাবই। দেখ্‌তেই হবে, ওটা আসলে মরুভূমি, না, এই পৃথিবীরই মত প্রাণীর জগৎ।

আপনারা কেউ এরোপ্লেনে চড়েছেন? না? কি দুর্ভাগ্য আপনাদের! বড় মজা—উড়ে যাওয়ার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই।

আমি তখন ছোট। মাথার ওপর দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে এরোপ্লেন উড়ে যেত, খবরের কাগজে ও বইয়ে এরোপ্লেনের গল্প পড়তুম, আর আমারও ইচ্ছা হত—আকাশপথে উড়ে যাই। এক-একদিন আমাদের বাড়ীর পাশের প্রকাণ্ড মাঠের ধারে বিশাল জামগাছটার একেবারে সেই মগডালে চড়ে বসতুম। সেখান থেকে বহুদূর অবধি

দেখা যেত। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতুম, মানুষ-জন সব বেঁটে বেঁটে, ঘর-বাড়ী চাপা চাপা, আর পথটা হয়ে গেছে যেন একখানা উত্তরীয়। ডাল্‌টা হাওয়ায় দুল্‌ত, আমার গা-হাত-পা শির্ শির্ করত। আমি সেখানে বসে কল্পনা করতুম, এরোপ্লেনে চড়ে দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে চলেছি। এখন অবশ্য আসল এরোপ্লেনে বসে সে কথা ভাবি, আর মনে মনে হাসি।

এরোপ্লেন চালানো খুব শক্ত কাজ নয়। আর, ওপরে উঠ্‌লেই যে মাথা ঘুরবে, গা বমি বমি করবে, এসব কথা একদম মিথ্যে। যে কেউ এরোপ্লেন চালাতে পারে।

আমাদের গাঁয়ের পাশেই একখানা সুবিশাল মাঠ। সেখানে একটা এরোপ্লেনের আড্ডা আছে। তাতে নানারকম বড় বড় ঘর। তার মধ্যে কোনটাতে এরোপ্লেন থাকে; কোনটা অফিস, কোনটা কারখানা, কোনটা মুসাফিরখানা, কোনটা বা হোটেল। সেদিকেও মাথার ওপর দিন-রাত এরোপ্লেনের এঞ্জিনের ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। রাতের বেলায় সেখানে নানারকমের আলো জ্বলে। এক-একটা আলো আকাশের বহুদূর থেকেও, এমন কি, গাঢ় কুয়াশা ফুঁড়েও পরিষ্কার দেখা যায়। একটা আলো আবার এমন আছে, সেটা জ্বাল্‌লে তিন মাইল

দূর থেকেও তার আলোতে স্বচ্ছন্দে বই পড়া যেতে পারে! সেখানে কত দূর দেশ থেকে এরোপ্লেন উড়ে আসছে, কত দূর দেশে উড়ে যাচ্ছে! কোনটা বা একদিনের পথ, কোনটা বা সাতদিনের পথ।

এক-একদিন রাতে আমার চোখে ঘুম আস্‌ত না। মাঠ ভেঙ্গে লুকিয়ে এরোপ্লেন ষ্টেশনে গিয়ে দেখতুম, কারখানায় মিস্ত্রীরা সু-উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বেলে কাজ করছে। অন্ধকার আকাশ থেকে একখানা এরোপ্লেন এসে মাঠে নাম্‌ল। তারপর সন্‌ সন্‌ শব্দে অফিসের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার লেজের দিকের দরজায় একটা সিঁড়ি লাগিয়ে, দরজাটি খুলে দেওয়া হল। একে একে যাত্রীরা নামছে। আমি চুপি চুপি সেখানে গিয়ে লুকিয়ে দেখতুম, ভেতরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বল্‌ছে। হাওয়ার গদী আঁটা চমৎকার চেয়ার। মাথার ওপর ঝক্‌মকে বাক্স্‌। ইচ্ছে করত, ভেতরে গিয়ে বসি, কিন্তু চৌকীদারের ভয়ে পারতুম না। মনের দুঃখ মনে চেপে তেমনি চুপি চুপি পালিয়ে আসতুম।

এ ত গেল যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের কথা। ওখানে আরও নানারকমের প্লেন আস্‌ত! সেগুলোর কোনটা অ্যাম্বুলেন্সের কাজ করে, কোনটা সৈন্যবাহী, কোনটা আকাশ

থেকে শত্রুদের ওপর মারাত্মক বোমা ফেলে, মেসিনগান ছুঁড়তে ছুঁড়তে উড়ে চলে। আবার কোন-কোনটা সখের ; কেবল একজন, দু'জন বা চারজনকে বয়ে নিয়ে যায়।

আমাদের গাঁয়ের সেই প্লেন-ষ্টেশনের কিছু দূরে একটা নির্জ্জন ও ফাঁকা জায়গায় পাইলটদের জন্য কয়েক সার ছোট ছোট বাংলো আছে। প্রত্যেক বাংলোর সমুখে একটু করে ফুলের চমৎকার বাগান। দূর থেকে জায়গাটাকে দেখায় যেন ছবি। পাইলট্‌রা কাজের শেষে সেখানে বেশ আরামে বিশ্রাম করে। আমি পাইলট্‌দের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সেখানে ঘোরা-ফেরা করতুম। কিন্তু কারো সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেতুম না। সকলেই গম্ভীর চালে আমাকে এড়িয়ে চল্‌ত। এতে আমারও জেদ বেড়ে গেল। যেমন করে পারি, আলাপ করবই ; এরোপ্লেন চালানো শিখ্‌তেই হবে।

এমনি ভাবে কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন বড় মজার উপায়ে একজনের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়ে গেল। তিনিও ছিলেন বড় আমুদে ও বেজায় চট্‌পটে। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে একখানা প্লেন থেকে নেমে মোটর বাইকে চড়ে বাংলোয় আসবার পথে ঠিক মোড়ে আমারই দোষে তিনি পড়তে পড়তে আশ্চর্য্য কৌশলে

"কিহে ছোকরা পথ দিয়ে না আকাশে চলছ ?"

সাম্‌লে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—"কি হে ছোকরা, পথ দিয়ে, না আকাশে চল্‌ছ? তুমি দেখ্‌ছি হাঁটতে শেখ নি। ওঠ আমার পেছনে, শীগ্‌গির—ব্যস্‌—"

আমিও তাই চাই। উঠে বস্‌তেই তিনি এঞ্জিন চালিয়ে দিলেন। বাইকখানা যেন সোঁ সোঁ শব্দে উড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। বোধ হয়, আধ মিনিটের মধ্যেই বাংলোর সাম্‌নে এসে থেমে পড়ল। আমি নামতেই তিনি বল্‌লেন—"কোথায় থাক? স্কুলে পড়? আচ্ছা, আবার পরশু বিকেলে দেখা হবে—বিদায়—" বলেই তিনি আরদালীর হাতে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে বারান্দায় উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। আমিও আর দাঁড়ালুম না। আনন্দে আমার পা তখন মাটিতে পড়ছে না। মনের ইচ্ছা পূরণ হবার সুযোগ হলে কার না আনন্দ হয়?

তারপরের দু'টো দিন কাটতেই চায় না। নির্দ্দিষ্ট দিনটা যেন হয়ে উঠ্‌ল খুব লম্বা; তার ঘণ্টাগুলো বড় বড়। ষাট মিনিটের জায়গায় মনে হতে লাগল, একশ কুড়ি মিনিট, কি তার চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। শেষে বিকেলের দিকে ভদ্রলোকটির বাংলোর দিকে গিয়ে দূর থেকে দেখি,. তিনি বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে বসে

চুরুট টান্‌ছেন্‌। আমি কাছে যেতেই বলে উঠ্‌লেন,—"আরে, এস, এস, বস—।"

আমি একখানা চেয়ার নিয়ে বসতেই তিনি বল্‌লেন,—"এরোপ্লেনের গল্প শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে নিশ্চয়? বড় মজার কল—না? আচ্ছা, বল ত এরোপ্লেনে চড়ে মানুষ কত ওপরে উঠ্‌তে পেরেছে? জান না? কোথাও পড় নি?"

"না—"

"সাড়ে সাত মাইলেরও বেশী। অর্থাৎ হিমালয় পাহাড়েরও ছ'মাইল ওপর। ব্যাপারটা বড় সোজা নয়। ওখানে এত ঠাণ্ডা যে, সকলে তা' সহ্য করতে পারে না। তাই সকলের পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। অত ওপরে মেঘও ওঠে না, এখানকার মত ওখানকার বাতাসে অক্সিজেনও নেই। তাই নিশ্বাস নেওয়া কঠিন। সেই জন্যে ওখানে যেতে হলে অক্সিজেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। মানুষের পক্ষে অত ওপরে ওঠা সম্ভব হলেও চিল-শকুন কিন্তু পারে না। উঠ্‌লেও তারা বাঁচবে না। আবার ছোট কীট-পতঙ্গ মাইল খানেক ওপরে উঠ্‌লে তৎক্ষণাৎ মরে যায়। তুমি হয়ত ভাব্‌ছ, সব প্লেনই অত ওপরে উঠ্‌তে পারে। কিন্তু তা' নয়। অত ওপরে উঠবার জন্যে যে

প্লেনগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো একটু অন্য রকমের। সেগুলোকে বলা হয় অটোজিরো। অটোজিরো দেখেছ? পাঁচ দিন আগে দু'খানা এখানে এসেছিল যে!"

তাঁর কথা শুনে মনে পড়ল, হাঁ দেখেছি বটে।

তিনি বল্‌লেন,—"একবার আমি কি রকম বিপদে পড়ি শোন। মাস কয়েক আগে একদিন আফ্রিকার এক অংশের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। ওড়বার সময় হাওয়া আফিস থেকে খবর পেলুম—ঝড়-বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে কথা উপেক্ষা করেই প্লেন ছেড়ে দিলুম। কিছু দূর বেশ চলেছি—হঠাৎ দেখি, সাম্‌নে খুব মেঘ করে এসেছে; আকাশের একটা দিক্ কালো। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় উঠল। চারদিক থেকে মেঘের দল কালো কালো বিরাট দৈত্যের মত ছুটে এসে আমায় ঘিরে ফেল্‌ছে। চোখে আর কিছু দেখতে পাই না। আমি মেঘের ফাঁক দিয়ে মেঘ ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠ্‌তে লাগলুম। কিন্তু সেখানেও খুব জোর হাওয়া আমার বিপরীত দিক্ থেকে হু হু করে ছুটে আস্‌ছে। এদিকে ট্যাঙ্কে পেট্রোলও বেশী ছিল না। আমি যে জায়গায় যাব বলে রওনা হয়েছিলুম, সে জায়গাটা তখনও কয়েক শ' মাইল দূরে। আমার প্লেনের গতি তখন ঘণ্টায় এক শ' মাইল। হিসেব করে

দেখ্‌লুম, যদি আড়াই ঘণ্টা তেমনি বেগে চল্‌তে পারি, তা'হলে বেঁচে যাব। কিন্তু যে ভাবে বাতাস ঠেল্‌তে হচ্ছে, তা'তে তা' সম্ভব নয়। এদিকে নীচে কোন সভ্য মানুষের বসতি নেই। অসভ্যদের আছে কি না, তাই বা কি করে বলি? চারধারে সুগভীর বন। আফ্রিকার বন! বুঝ্‌তেই পারছ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। তা' ছাড়া, বনের মধ্যে এমন ফাঁকা জায়গা নেই যে, নাম্‌তে পারি। বেতারে একবার নীচে যে কোন বেতার-ষ্টেশনে খবর পাঠালুম, আমার অবস্থা জানিয়ে। কিন্তু কোন উত্তর পেলুম না। উত্তর পাবই বা কি করে? আমারই প্লেনের বেতারের কলটা তখন গেছে বিগড়ে।

তবুও আরও কিছু দূর উঠে গেলুম। সেখানেও তেমনি জোর হওয়া! অগত্যা নামতে লাগ্‌লুম। নাম্‌তে নাম্‌তে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমি সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। একদিকে তীর, ঝড়ে ভিজে বনের গাছ-পালার মাতামাতি, আর একদিকে সমুদ্র পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ তুলে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করছে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই। এইখানে একদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কেবল বালি; মাঝে মাঝে বালির ঢিপি। দূরে একধারে খান দুই ঘর দেখা গেল। যা থাকে কপালে ভেবে

তারা ছুটে এসে প্লেনখানাকে ঘিরে দাঁড়াল

সেইখানেই নেমে পড়লুম। সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে দেখি, একদল নিগ্রো। প্রত্যেকের হাতে বর্শা। তারা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। মনে করলুম, তারা হয় ত আমার অনিষ্ট করবে। সেই জন্যে রিভলভার বার করে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌লুম। কিন্তু তারা ছুটে এসে আমার প্লেনখানাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন, মনে হল তাদের সর্দ্দার, হাত দিয়ে সেই ঘর দু'খানা দেখিয়ে আমাকে সেখানে যেতে ইসারা করতে লাগ্‌ল। সকলেরই মুখে-চোখে বিস্ময়। একজন আবার তার লম্বা বর্শার আগাটা প্লেনের চাকায় একটু ছুঁইয়েই টেনে নিলে।

সর্দ্দার আকারে-ইঙ্গিতে আমায় জানিয়ে দিলে, কিছুদিন আগে সেখান দিয়ে একখানা উড়ো-নৌকো উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাতে আগুন লেগে যায়। পাইলট প্যারাচুটের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে সমুদ্রে নেমে পড়ে। প্লেনখানাও জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে তার পাশে এসে পড়ে। ঘটনা-গুলো একেবারে তাদের চোখের সাম্‌নে ঘটেছিল। তারা ক্যানো নিয়ে সেই লোকটাকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে।

বৃষ্টির বেগ কমে এলেও বাতাসের জোর তখনও তেম্‌নি। আমি প্লেন থেকে নেমে তাদের সঙ্গে সেই ঘরে

চাক্‌মা বেবুন।

গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ওখান থেকে বিশ মাইল দূরে এক বুয়োর সাহেবের বাড়ী ছিল। তিনি সেখানে আনারসের চাষ করতেন। আমি সেই দিনই একজন নিগ্রোর মারফৎ তাঁর কাছে আমার অবস্থা জানিয়ে পেট্রোল চেয়ে পাঠালুম। একে অন্ধকার রাত, তার ওপর সেদিকে চাক্‌মা বেবুনের আড্ডা। চাক্‌মা বেবুনের নাম শুনেছ? বড় ভয়ঙ্কর প্রাণী। সুখের বিষয়, ও জানোয়ারগুলো আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ওদের যত শয়তানী সব অন্ধকার রাতে। ওদের গায়ে যেমন জোর, দাঁতেও তেমন ক্ষুরের মত ধার। বনের মধ্য দিয়ে একা যেতে যেতে লোকটা ঐ চাক্‌মাদের হাতে পড়ে। কিন্তু নেহাৎ ভাগ্য বল্‌তে হবে, একটা চিতাবাঘ তাকে বাঁচায়।

আমার কথা শুনে হাস্‌ছ। ভাব্‌ছ, চিতাবাঘ আবার মানুষকে বাঁচায়? কিন্তু ব্যাপারটা শুন্‌লে হাসির বদলে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠবে। বেবুনের বাচ্চা দেখ্‌লে চিতা বাঘের জিভ্‌ দিয়ে জল পড়ে। সেই জন্যে বেবুনের পালের কাছে কাছে দু'একটা চিতা খুব গোপনে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে থাকে। গোপনে থাকে এই জন্যে যে, একবার যদি বেবুনের হাতে পড়ে, তা'হলে তার আর রক্ষা নেই। বেবুন-বাচ্চা খাওয়ার সাধ চিতার জন্মের মত ঘুচে যাবে।

তা, আমার সেই নিগ্রো লোকটা ত চলেছে। হঠাৎ দেখে সাম্‌নে একপাল বেবুন এক চাষার ক্ষেত লুঠ করে বেরিয়ে আস্‌ছে। তারা বোধ হয়, সেখানে মানুষের তাড়া খেয়ে থাক্‌বে। আবার সাম্‌নেই এক মানুষ। মেজাজ ছিল বিগড়ে। দেখা মাত্রই তার দিকে ছুটে এল। আর, ঠিক তখনই একটা চিতাবাঘ জ্বলন্ত চোখে একটা বেবুন বাচ্চার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু ব্যাপারটা সর্দ্দার বেবুনের সুতীক্ষ্ণ চোখ এড়াতে পারল না। সে একটা শব্দ করে চিতাবাঘটার পিছনে ধাওয়া করল। তার সঙ্গে সমস্ত দলটাও চক্ষের পলকে ছুট্‌ল। কিন্তু কোথায় গেল, শেষে চিতাবাঘটার দশা কি হ'ল, এসব কথা আর জানা গেল না। লোকটা তৎক্ষণাৎ বনের মধ্য দিয়ে ছুট্ দিল।

ওখানে আমি পূরো একদিন ছিলুম। তুমি প্লেনে চড়্‌বে?'

কথাটা শুনেই আনন্দে আমার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগ্‌ল। নিশ্চয়ই চড়ব! আকাশ-পথে উড়ে যাওয়ার মত মজার আর কিছু আছে? বললুম—হাঁ।

তার পর দিন তাঁর সঙ্গে প্লেনে উঠ্‌লুম। সেখানা ছিল বাইপ্লেন। সে যে কি মজার—যে না চড়েছে তাকে বোঝানো যায় না।

মাঠের ওপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দেখি, গাঁ, মাঠ, ধানক্ষেত, নদী, বাড়ী-ঘর, রাস্তা, মানুষ-জন ক্রমে ছোট হয়ে, মিলিয়ে যাচ্ছে। প্লেনখানা ক্রমে উঠতে উঠতে মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে এক দিকে উড়ে যেতে লাগল। কিন্তু আশে পাশে কোথাও কোন স্থির বা সচল কিছু না থাকায় ঠিকই কর্‌তে পারলুম না যে, উড়ে যাচ্ছি। কেবল কলের ও পাখার প্রচণ্ড শব্দ, একটানা হাওয়ায় ও মিটার দেখে মনে হতে লাগ্‌ল, আমরা উড়ে চলেছি। আমাদের প্লেনের গতি ঘণ্টায় ছিল আশী মাইল। সেদিন উড়েছিলুম মাত্র বিশ মিনিট। তারপর আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি ওপরে উঠে প্লেনের নানারকম কসরৎ দেখাতে লাগলেন—

কখনও এক দিকে কাৎ হয়ে, কখনও প্লেনখানাকে একেবারে উল্টিয়ে তার মাথা মাটির দিকে করে, কখনও ওপর থেকে পড়ে যাবার মত হয়ে সোজা নীচের দিকে এসে, কখনও চরকীর মত ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে, কখনও বা একেবারে খাড়া হয়ে ওপর দিকে উঠে। প্রতিবারেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি প্লেনশুদ্ধ বা প্লেন থেকে তিনি নীচে পড়ে গেলেন।

আমার গা-হাত-পা শির্ শির্ করতে লাগল। লোকটার কি দুর্জ্জয় সাহস!

কিন্তু তখন মনে পড়ল না যে, প্লেন থেকে পড়া সহজ নয়। আর পড়লেও পিঠে প্যারাচুট বাঁধা। পড়তে পড়্তে ওর একটা আংটা খুলে দিলেই প্যারাচুটটা ছাতার মত হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে। তিনি তাই ধরে ধীরে মাটিতে নামবেন। তেইশ হাজার ফুট ওপর থেকেও লোকে নির্ভয়ে প্লেন থেকে নীচে লাফ দেয়। এই সেদিন তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্যারাচুট থাকার দরুণ লোকটা নিরাপদে নীচে নেমে এসেছিল। পাইলটদের সাহসের কত গল্প যে আছে, বলে শেষ করা যায় না।

যাক্, তারপর শুনুন। সেদিন থেকে আমার মাথায় ঢুক্ল—ওড়া শিখতেই হবে। অথচ আমার এমন অবস্থা নয় যে, পয়সা খরচ করে শিখতে পারি। কিন্তু তার আগে আবার একদিন উড়্তে হবে, অনেক দূরে। সেই ভদ্রলোকটিত তারপর উড়ে চলে গেলেন। আমিও নানারকম ফন্দী আঁট্তে লাগলুম।

একদিন দেখলুম, মাথার ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা প্লেন আকাশে ডানা মেলে ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ে এসে ঘুরতে ঘুরতে ষ্টেশনে নামল। তার তিনটে এঞ্জিন।

পাইলট ও ক্রু ছাড়া বারো জন যাত্রী তাতে চড়তে পারে। প্লেনখানা সেখানে যাত্রী নেবার জন্যে নেমেছিল। সেই দিনই আবার চলে যাবে। মনে হল, এবার আমার ফন্দীটা কাজে খাটানো যাবে।

শীতকাল। বেলা তখন ত্বপুর। প্লেনখানা ছিল মাঠের এক ধারে। কাছে গিয়ে দেখি দরজা খোলা, সিঁড়িটাও লাগানো আছে। ঝাড়ুদার সবে ভিতরটা পরিষ্কার করে বেরিয়ে গেছে। আরও ত্ব'চারজন এদিকে-ওদিকে কাজ করছিল। মিস্ত্রীরা এঞ্জিন পরীক্ষা করছে। আমি এদিক-ওদিক করতে করতে তাদের সকলের চোখ এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাথরুমের ভিতর ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলুম।

তখনই মনে হল, কে যেন খুব তাড়াতাড়ি আমার পিছনে পিছনেই ভেতরে উঠে এল। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। লোকটা এসে বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়াল। সর্ব্বনাশ! এই বুঝি দরজা খুলে আমাকে টেনে বার করে! ঐ ত ধাক্কা দিচ্ছে। শেষকালে ধরা পড়ে গেলুম? আমার গা-হাত-পা থর্ থর্ করে কাঁপছে। তবুও যথাসাধ্য চুপ করে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম। লোকটাও এদিক-ওদিক করতে

লাগল। তারপর শিষ্ দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হলুম।

কিছুক্ষণ যায়। জানালা দিয়ে দেখতেও সাহস করি না, যদি কেউ বাইরে থেকে দেখে ফেলে। কিন্তু বাথরুমে বসে থাক্‌তেও ভাল লাগে না। এমনি করে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর প্লেনটাতে একটু চুক্-ঢাক্ শব্দ হতে লাগল। আন্দাজে বুঝলুম, যাত্রীদের মাল উঠছে। সেই সঙ্গে দু'একজন করে যাত্রী উঠ্‌তে লাগল। তাদের কথা-বার্তার আওয়াজে মনে হ'ল, সকলেরই মনে খুব স্ফুর্তি।

তারপর আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। ইতিমধ্যে বোধ হয়, সব যাত্রী ও মালপত্র উঠেছে। একবার খুব সাবধানে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলুম, অফিস ঘর থেকে প্লেন ছাড়বার সঙ্কেত কর্‌লে। প্লেনও ছেড়ে দিল। মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। ষ্টেশন পিছনে পড়ে রইল। অফিস ঘর ক্রমে ছোট হয়ে আস্‌ছে। দেখলুম, সেখান থেকে প্লেনের সঙ্গে একটা সঙ্কেত হল। তারপরই তাকিয়ে দেখি, আমাদের প্লেনখানা শূন্য দিয়ে উড়ে চলেছে। এই সময়ে ষ্টেশনের সঙ্গে প্লেন থেকে বেতারে কথাবার্তা হয়ে থাকে। আমাদের প্লেন থেকেও নিশ্চয়ই হয়েছিল।

আমরা ত উড়ে চলেছি। আকাশ বেশ পরিষ্কার।

কেবল পশ্চিমে একদল সোনালী মেঘ সূর্য্যের চারদিকে নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছে। তারপর বোধ হয়, একঘণ্টা উড়েছি। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, সব ধোঁয়া। বুঝলুম, আমরা অনেক ওপরে উঠেছি। বেশ একটু শীত করছে। এমন সময় যাত্রীদের মধ্যে খুব গোলমাল সুরু হল। বুঝলুম, বেশ একটা হুটোপুটি হচ্ছে, কি ব্যাপার দেখবার কৌতূহল হল; কিছুতেই তা' দমিয়ে রাখতে পারলুম না। বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, একজন বেশ লম্বা-চওড়া যাত্রী প্লেন থেকে নামবার দরজাটি খুলে শরীরের অর্দ্ধেক বার করে দিয়েছে। আর তাকে অন্য যাত্রী ও একজন ক্রু ভেতরের দিকে টানছে। লোকটা কিছুতেই আসবে না, বাইরে যাবেই। ভাবলুম, সে বোধ হয়, আত্মহত্যা করতে চায়।

এমন সময়ে পাইলট এল। তারপর সকলে মিলে তাকে টানাটানি করে ভেতরে আনলে। আমিও সেই ফাঁকে সেখান থেকে সরে পড়লুম। কিন্তু এবার আর বাথরুমের ভেতর গেলুম না। রেষ্টুরাণ্ট কামরার ভেতর দিয়ে মাল-কামরার মধ্যে চলে গেলুম। তখন ইলেক্‌ট্রিক উনুনে রান্না হচ্ছিল। কাট্‌লেট্ ভাজার চমৎকার গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। কিন্তু সেখানেও ধরা পড়বার খুব সম্ভাবনা। যে

কোন মুহূর্তে রেষ্টুরাণ্টের লোকদের চোখে পড়তে পারি। যতদূর সম্ভব গুঁড়ি-গুড়ি মেরে একটা মালের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইলুম।

রাঁধুনিদের কথাবার্তায় বুঝলুম, সেই লোকটা যাবে অনেক দূর। কিন্তু তার মাথায় খেয়াল চেপেছে যে, উড়ন্ত প্লেনের ডানার ওপর হেঁটে বেড়াবে। [illegible] নাকি অনেকে এ রকম করে—পিঠে প্যারাচুট না বেঁধেই। এই জোর হাওয়ায় যে কোন মুহূর্তেই ত সে উড়ে নীচে পড়ে যেতে পারে। তখন তার চিহ্নটুকুও থাকবে না। কি অদ্ভুত!

এমন সময় মনে হ'ল প্লেনখানা নীচে নামছে। রাঁধুনিরা বল্‌লে,—"ঐ যে একটা ষ্টেশন। কিন্তু এখানে ত নামবার কথা ছিল না। কিছু বিপদ হল না কি?" মনে হ'ল, সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কি ব্যাপার?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্লেনখানা নীচে নেমে এল। তারপর ষ্টেশনে থাম্‌তেই সেই [illegible] পাইলট নামিয়ে দিলে। বল্‌লে,—"আপনার মত যাত্রী নিয়ে যাওয়া আমি নিরাপদ মনে করি না।"

লোকটা অনেক অনুনয় করতে লাগ্‌ল। কিন্তু তার কথা কে শোনে? একজন ক্রু তার মাল নামাতে এসেই

শক্ত করে আমার ঘাড় চেপে ধরলে

দেখে, মালের অ.ড়ালে আমি ! চোখ দু'টো কপালে তুলে—
"এ কে ? চোর ?" বলতে বলতে ছুটে এসে শক্ত করে
আমার ঘাড় চেপে ধরলে। ইচ্ছে করছিল, তৎক্ষণাৎ
তার নাকে একটা ঘুষি লাগিয়ে দিই। চোর ? আমি
চোর ? কখনই না।

শান্ত কণ্ঠে বললুম—"আমি চোর নই। আমাকে,
ছেড়ে দিন।"

তার কথা শুনে দু'চারজন সেখানে এসে পড়ল।
পাইলটও এল। সে জিজ্ঞাসা করলে,—"চোর নয় তবে,
তুমি এখানে কেন ?"

বললুম—"উড়তে ইচ্ছে হয়েছে বলে—"

"কি করে এলে ?"

সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বল্‌তেই সে রুখে বললে,—
"ওকে নামিয়ে পুলিশের হাতে ছেড়ে দাও। তারা যা'
উচিত মনে করে, তাই করবে—"

দুঃখে আমার চোখ ফেটে জল এল। তারা আমাকে
প্লেন থেকে নামিয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে প্রকাণ্ড ফড়িংয়ের
মত ডানা মেলে আকাশের একদিকে উড়ে চলে গেল।
আমি সেদিকে তাকিয়ে কনষ্টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর আমাকে দারোগা সাহেবের সমুখে হাজির

করা হ'ল। তিনি ত সব শুনে খড়ের আগুনের মত দপ্ করে জলে উঠ্লেন। হয় ত দু' চার ঘা বসিয়েও দিতেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পিছন থেকে কে যেন ঘরে ঢুক্তে ঢুক্তে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি ব্যাপার, দারোগা সাহেব্ ?"

স্বরটা যেন চেনা ; তাকিয়ে দেখি, সেই পাইলট্টি। তিনি ত আমাকে সেখানে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি হে বিজয়, তুমি এখানে যে ?"

আমি তাঁর কাছে সব বল্তেই তিনি খুব এক চোট হেসে নিলেন। তারপর দারোগা সাহেবের কানে কানে কি যেন বল্তে সাহেব আমাকে খুব জবর এক ধমক দিয়ে বল্লেন,—"ভাগো, এখান থেকে। আর কখনও যদি দেখি, এ রকম করেছ, তা'হলে"—বলে মোটা বেতখানা তুলে টেবিলের ওপর ঘন ঘন ঘা দিতে লাগ্লেন।

আমিও মনে মনে বল্লুম,—"আচ্ছা—"

ব্যাপারটা এমন সহজভাবে চুকে গেলেও আমার বিপদ ঘুচল না। একে ত বিদেশ, তার ওপর পকেটে পয়সা নেই, শীতও পড়েছে দারুণ। গায়ে যে জামা-কাপড় আছে, তা' যথেষ্ট নয়। দারোগা সাহেবের কাছ থেকে বাইরে আস্তেই পিঠে কার স্পর্শ পেলুম। তাকিয়ে দেখি,

সেই পাইলটটি। তিনি বললেন,—"তুমি চল, আমার সঙ্গে। আমার কাছেই থাকবে। তোমার যখন এত আগ্রহ, আমি তোমাকে প্লেন চালাতে শেখাব।"

কোন কিছু শিখবার বা জানবার প্রবল আগ্রহ থাকলে, তা' পূরণ হয়ই। এ কথাটা আমি খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছি। আপনারাই বলুন সত্য কি না? সেই দিন থেকে তাঁর শিষ্য হলুম। তিনিও আমাকে খুব স্নেহের সঙ্গে সব শেখাতে লাগলেন।

একদিন গেলুম সেখান থেকে অনেক দূরে এক জায়গায় উড়ো-নৌকো দেখতে। একটা বিশাল হ্রদের জলে সেগুলো ভাসছে। কত রকমের উড়ো-নৌকো যে আছে, না দেখলে ধারণা হয় না। একখানা দেখলুম, বারো এঞ্জিনওয়ালা। তা'তে এক শ' তিনশ জন লোক চড়তে পারে। আবার কোনটা বা দু'জন, কোনটা চারজনের চড়বার মত। এক খানা ছিল, একজন চড়বার। সেখানা বোধ হয়, ঘণ্টায় তিন শ' মাইল চলে যেতে পারে।

জেপলিন সকলেই দেখেছেন। দেখেন নি? দুর্ভাগ্য নিশ্চয়। তা'তে চড়ে ইটালীর ক্যাপ্টেন নোবিলে, তার পর জার্মানীর ডাঃ একনার উত্তর মেরুর ওপর গিয়েছিলেন, শুনেছেন ত? জেপলিন আকাশে যখন ওড়ে, তখন নীচে
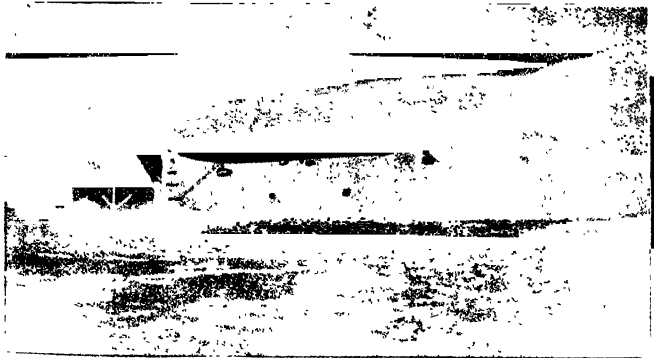
জেপেলীন

বোমাবর্ষণকারী প্লেন।

থেকে মনে হয় যেন একটা বড় চুরুট। কিন্তু জেপিলিন কেবল মানুষ বয়ে' নিয়ে যায় না, কোন কোনটার গায়ে আবার দু'একখানা এরোপ্লেনও ঝোলে। দেখলে মনে হয়, আকাশ সমুদ্রের তিমি ও তার বাচ্চা। দরকার হলে তা' উড়ে যেতে পারে এবং ফিরে এসে আবার জেপিলিনের পেটের নীচে আশ্রয় নিয়ে থাকে।"

"যাক্ সে কথা। তারপর আমি সেই ভদ্রলোকটির অনুগ্রহে এরোপ্লেন চালানো শিখলুম। এখন প্যারাচুট ধরে দশ হাজার ফিট ওপর থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামতে পারি। প্যারাচুট ধরে একবার একজনের রান্নাঘরের ছাতে, আর একবার এক প্রকাণ্ড গাছের মাথায় নেমে পড়েছিলুম। দশ হাজার ফিট ওপর থেকে লাফ দেবার সময় আমার একটুও হাত-পা কাঁপে নি বা কোন দিন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি নি। আপনারা যদি শুনে থাকেন, অত ওপর থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়তে পড়তে লোকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তা'হলে ভুল শুনেছেন। বরং খুব আরাম লাগে। এত আরাম যে বলা যায় না। তবে সময় মত প্যারাচুট না খুললে মারা যাবারই সম্ভাবনা। এই ত সেদিন আমরা দু'জন দু'খানা এরোপ্লেন থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়বার সময় একজনের প্যারাচুট সময়মত খুলল না।

যখন খুলল, তখন সে মাটি থেকে মাত্র যাট্ ফুট ওপরে। নামতে নামতে দেখ্লুম, লোকটা নীচে পড়ে একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমরা ওপর থেকে বা নীচের কেউ তাকে সাহায্য করতে পারলুম না।

এরোপ্লেনের সাহায্যে মানুষ কত আশ্চর্য্য কাজ যে করবে, তা' কল্পনা করা যায় না। কেউ কি জানতো, কাঞ্চন-জঙ্ঘার মাথার ওপর উঠে তার ছবি নেওয়া যাবে? হয়ত একদিন শোনা যাবে, এদেশেরই কেউ চন্দ্রলোক বা মঙ্গল গ্রহে উড়ে গেছেন। সকলে তাঁর অপেক্ষায় থাক্‌বে। তারপর একদিন দেখা যাবে, সেই মহাবীর নিরাপদে আমাদের পৃথিবীতে ফিরে এসে সেখানকার গল্প বল্‌ছেন।

আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন, বিনা পাইলটে এরোপ্লেন চালাবার চেষ্টা চলছে। কোন কোন দেশে তা' এখন হচ্ছেও। এটা সত্যি বড় আশ্চর্য্যের,—কোন পাইলট নেই, অথচ এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। প্লেনখানা এমনভাবে তৈরী যে, নীচে থেকে বেতারের সাহায্যে তার কল-কব্জা চলে। বেতার-অপারেটরের ইচ্ছামত প্লেনখানা ওড়ে, শূন্যে ঘুরপাক দেয়, ডিগবাজী খায়, নীচে নামে। একবার বড় মজার ব্যাপার হয়েছিল। ঐ ধরণের একখানা প্লেন উড়ছে

উড়তে এমন বিগড়ে গেল যে, অপারেটরের কথা আর না শুনে ক্রমাগত একদিকে উড়ে যেতে লাগ্‌ল। অপারেটর নীচে থেকে বেতারের সাহায্যে শত চেষ্টা করে সেটাকে ফেরাতে যায়, প্লেনখানা তবুও অবাধ্যের মত উড়ে চলে। উড়তে উড়তে ক্রমে সেটা আকাশের এককোণে মিলিয়ে গেল। সেখানে আর কোন প্লেনও ছিল না যে, তার পিছনে ধাওয়া করবে। তখনই চারদিকে বেতারে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল, একখানা প্লেন পালিয়েছে, সকলে যেন সতর্ক থাকে।

ওদিকে সেখান থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে কৃষকরা এক ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় দেখে, তা'দের মাথার ওপর একখানা প্লেন উড়ছে। জায়গাটা একেবারে অজ পাড়াগাঁ। সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে ছোট একটা পোষ্ট অফিস ছিল। কৃষকরা দেখ্‌লে, প্লেনখানা ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে নীচের দিকে নাম্‌ছে। তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সেখান দিয়ে প্লেন উড়ে গেলেও তার কোনদিন কোন প্লেন সেখানে নাম্‌তে দেখে নি। আর, নামবেই বা কোথা? ক্ষেতের মধ্যে ত প্লেন নামে না, কিন্তু এ প্লেনখানা দেখতে দেখতে ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়্‌ল। কৃষকরা ভাব্‌লে, প্লেনের নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে, তাই পাইলট আর না এগিয়ে

সেখানেই নেমে পড়ল। পাইলটের কাছ থেকে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে তারা সকলে কাস্তে হাতে সেই দিকে ছুটল।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে সকলে প্রতি মুহূর্তেই মনে করে, এই বুঝি পাইলট প্লেন থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোথায় পাইলট? কাছে গিয়ে দেখে, ককৃপিট ( বস্‌বার জায়গা ) খালি! তারা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সকলে ভাবলে, পথের মধ্যে নিশ্চয়ই সে প্লেন থেকে পড়ে গেছে। তখনই একজন ছুট্‌ল পোষ্ট অফিসে খবর দিতে।

খবর শুনে পোষ্টমাষ্টারও খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তার পাঠালেন বড় পোষ্ট অফিসে। সেখান থেকে উত্তর এল,—"লোক যাচ্ছে। ভয় নেই।"

লোক এলে তার মুখে সব শুনে সকলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। আবার কেমন বোকা বনে গেছে ভেবে, এক চোট খুব হাসাহাসিও করেছিল নিশ্চয়। বোধ হয়, বুঝ্‌তে পারছেন, প্লেনখানা কেন হঠাৎ ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়েছিল? পেট্রোল ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে—পেট্রোল থাক্‌লে আরও কতদূর উড়ে যেত ঠিক কি?

কথায় কথায় অনেক বলে ফেল্‌লুম। এখন বুঝ্‌তে পারছেন বোধ হয়, আমি কি করি? জীবনটা যে খুব নিরাপদ তা' নয়। কিন্তু বড় সুখের ও মজার। কিছুদিনের

ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছি। সেখানে কিছুদিন থাকব। মাঝে মাঝে গাঁয়ের জন্তে মন কেমন করে। এত দেশ ঘুরেছি, কিন্তু ওর মত সুন্দর আর কিছু নেই।

আমার যিনি গুরু ছিলেন, সেই পাইলটটি কিছুদিন আগে প্রশান্ত মহাসাগর পার হবার সময় ঝড়ে প্লেন শুদ্ধ পড়ে ডুবে মারা যান। জায়গাটা দেখে আস্ছি। সেখানে সাধারণতঃ জাহাজ যাতায়াত করে না; একশ' মাইল দূরে একটা ছোট দ্বীপ থাকলেও, তাতে কোন লোক বাস করে না। কাজেই সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া ভাগ্যের কথা।"—বলে বিজয় চুপ্ করলেন। তারপর আবার বল্লেন, "এরোপ্লেনের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে। আমার মনে হয়, একদিন এমন প্লেন তৈরী হবে, যা, পানকৌড়ীর মত জলে ডুব দিয়ে, রাজহংসের মত জলে ভেসে, উট পাখীর মত ডাঙ্গার ওপরে ও ঈগল পাখীর মত আকাশ-পথে যাওয়া-আসা করবে। পৃথিবীর কোন জায়গা অজানা থাকবে না—উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে লোকে গ্রীষ্মের সময় বেড়াতে যাবে।

প্লেন যেমন মানুষের উপকারে লাগ্ছে ও লাগ্বে, তেমনি যুদ্ধের সময় ওর মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই ও থাক্‌বে না। শুন্ছি, ভবিষ্যতে প্লেন থেকে শত্রুদের ওপর আর বোমা না ফেলে লোকে বোমাগুলোকেই প্লেনের মত

তৈরী করে বেতারের সাহায্যে উড়িয়ে শত্রুদের গ্রাম, নগর, সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে ফেল্‌বে। কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র!"—বলে ভদ্রলোকটি চুপ্‌ করলেন।

# মোহনের গল্প

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বললেন,—"আমি একজন সামান্য লোক। আকাশের খবর বল্‌তে পারি না, সমুদ্রের কথা কিছু জানি। তাই বল্‌ব।

অল্প বয়সেই আমি জাহাজের কাজে লেগেছিলুম। কিন্তু কি করে—সেটুকু আপনাদের বলি।

আমাদের গাঁয়ের বিশু নেয়ে একবার কিছুদিনেব ছুটি নিয়ে বাড়ী এল। লোকটা জাহাজে চাকরী করত, সেই জন্যে বহুদেশ ঘুরেছিল।

সে বাড়ী এলেই আমরা তার কাছে দেশ-বিদেশের গল্প শুনতে বসতুম। সেবারও সে ব্রেজিলের গল্প শুনিয়েছিল। তার ফিরে যাবার দিন তিনেক আগে একদিন তাকে বললুম,—"বিশুদা, তোমার জাহাজে আমারও একটা কাজ হয় না?"

"কেন রে?"

"দেখতেই ত পারছ, আমাদের অবস্থা"—

"হোঃ! কুচ্‌ পরোয়া নেই। কিন্তু যেতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।"

বললুম,—"দেখে নিও আমি ভীরু কি না—"

বিশু আমার কথা শুনে একটু উপেক্ষার হাসি হাসল। আমিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম,—আমার সাহসে তাকে অবাক্ করবই।

সমুদ্রের সম্বন্ধে অনেক ভয়ের কথা শোনা ছিল। শুনেছিলুম, সমুদ্রে কেবল ঝড় হয়, জাহাজ ডোবে, বড় বড় সাপ জলের ওপরে ভাসতে ভাসতে গলা বাড়িয়ে জাহাজের ডেক—ডেক কেন, একেবারে সেই মাস্তুলের আগা থেকে নাবিকদের ধরে গিলে ফেলে। কিন্তু এখন দেখছি, এসব একদম বাজে কথা। ঝড় হয় সত্য, তবে তা' অনবরত নয়। আর ঝড় হলেই তাতে জাহাজ ডোবে না। কতকাল আগে থেকে মানুষ সমুদ্র-পথে যাওয়া-আসা করছে। কত রকমের জাহাজ তৈরী হচ্ছে। মানুষের অভিজ্ঞতা, সাহস ও বুদ্ধি প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় তাকে বেশীর ভাগ সময় রক্ষা করে। অবশ্য কখনও কখনও নির্জ্জন সমুদ্র-বক্ষে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। কিন্তু সে সময়ও

মানুষ কেমন সাহস, শক্তি, বুদ্ধি ও গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দেয়, সে সব গল্প হয় ত আপনারা শুনে থাক্‌বেন। শুনেছেন? ভাল কথা। আমিও অনেক জানি। কিন্তু এখানে সেগুলো বল্‌বার সুবিধা নেই। আবার যদি কখন দেখা হয়, বল্‌ব।

যাক্‌। বিশুর কাছ থেকে বাড়ী এসে সে রাতে আমার চোখে ঘুম আর আসে না। চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল—বিশাল নীল সমুদ্র, তাতে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ উঠছে, আর সেই ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভাস্‌ছে আমাদের জাহাজখানা। জাহাজের আশে-পাশে বড় বড় হাঙর, তিমি প্রভৃতি।

বাড়ীতে আমার এক খুড়ীমা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন। ভাব্‌তে লাগলুম, কথাটা তাঁর কাছে বল্‌ব কিনা। শুনলে তিনি কখনই আমাকে যেতে দেবেন না। তবুও লুকিয়ে যাওয়াটা কি ভাল? শেষে ঠিক করলুম, বল্‌বই। এতে তাঁর যা' মনে হয় হবে।

কিন্তু পরদিন তাঁর কাছে কথাটা বল্‌তেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লেন,—"আচ্ছা, তোমার তাতে যখন ভাল হবে, তাই কর।"

আনন্দে তখন আমার চোখে জল এল। এমন মানুষ আমি কখন দেখিনি।

বিশু নেয়েকে তখনই গিয়ে খবরটা দিলুম এবং তারই সাতদিন পরে তার সঙ্গে রওনা হয়ে পড়লুম।

বিশু তখন যে জাহাজে কাজ করছিল, সেটা যাত্রী, মাল বা যুদ্ধের নয়। জাহাজখানা বেরিয়েছিল সমুদ্রের নীচে কোথায় কি আছে জানবার জন্যে। ছোট জাহাজ; খুব জোরেও চল্‌তে পারে না। ঘণ্টায় বার চৌদ্দ মাইল মাত্র যায়। সমুদ্রের মাইলকে ডাঙার মাইলের চেয়ে কয়েক শ' গজ বেশী ধরা হয়। দিন-রাত তার চলার বিরাম নেই। বিশুর চেষ্টায় আমি হলুম তার একজন শিক্ষা-নবীশ কর্ম্মচারী। কাজ খুব কঠিন না হলেও তাতে বিশ্রাম ছিল না। আর, কোন কিছু শিখবার সময় যত কম বিশ্রাম নেওয়া যায়, ততই ভাল। না হলে সে বিষয় ভাল করে শেখা যায় না।

প্রথমে আমরা চল্‌লুম—সমুদ্রের গভীরতা মাপতে মাপ্‌তে। কিন্তু তার বা দড়ি ফেলে নয়—আগে লোকে তাই করত। এখন সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় একটা কলের সাহায্যে। কলটা জাহাজে বসানো থাকে। ঐ অঞ্চলে তখন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার ফেলা

হবে। কিন্তু তার আগে জলের নীচে কোথায় কি আছে জানা চাই ত। ঐ তলমাপা কলটা ছিল বড় মজার। সেই কল থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে জলের নীচে মাটিতে ধাক্কা মারে। তা'তেই জানা যায়, জায়গাটা কত গভীর।

সারাদিন জল মাপার কাজ চলেছে। মাঝে মাঝে জলের নীচে কোথায় কতখানি তাপ, তাও থারমোমিটার দিয়ে দেখা হচ্ছে। সমুদ্রের নীচে যে থারমোমিটার দিয়ে তাপ মাপা হয়, তা কেউ দেখেছেন? দেখেন নি? সে আমাদের এই জ্বর দেখা থারমোমিটারের মত নয়। ও রকম একটা থারমোমিটার দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিলে, গভীর জলের নীচে, ধরুন পাঁচশ' ফিট নীচে, জলের ভীষণ চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে ঠিক ময়দার মত হয়ে যাবে। এ ত হল কাচ। পিতল, তামা, লোহার জিনিষও চেপ্টে থেঁৎলা অদ্ভুত আকারের হয়ে যায়। সে রকম থারমোমিটার একটা কাছে থাক্‌লে দেখাতুম—কেমন দেখ্‌তে। নইলে কথায় বল্‌লে বুঝ্‌তে পারবেন না।

আবার জলের নীচে কোথায় কেমন স্রোত, কোন-দিকে কত জোরে তা বইছে, তাও এক রকম কল নামিয়ে দেখা হ'ত। বিশুর এসব ভাল লাগ্‌ত না। এ সব আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতুম। বিশু বল্‌ত,—"লোকগুলো

পাগল। জলের নীচে কি আছে, তোদের জানবার কি দরকার রে বাপু? তোরা কি সেখানে ঘর-বাড়ী বানিয়ে থাক্‌বি নাকি? তার চেয়ে চল্‌ মুক্তো-টুক্তো তোলা যাক্‌, কি কোনো ডুবোজাহাজের সন্ধান করে তার মধ্যে সেঁধিয়ে সোনা তুলে আনা যাক যে কাজ দেবে। তা' নয়, কেবল বাজে কাজ—"

তার কথা একদিন ক্যাপ্টেনের কানে গেল। ক্যাপ্টেন তাকে ডেকে বল্‌লেন,—"বিশু, এখান থেকে মাইল কতক দূরে একখানা ডুবো জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। জাহাজখানাতে নাকি পাঁচ লক্ষ টাকার সোনা আছে। কিন্তু তুমি ছাড়া আর কোন লোককে ত পাচ্ছি না যে, সেগুলো জলের নীচে থেকে তুলে আনে—যাবে বিশু?" —বলে ক্যাপ্টেন গম্ভীর হয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

বিশু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বল্‌লে,—"আজ্ঞে, কর্ত্তা, জলের নীচে?"

"হাঁ—পাঁচ শ' ফিট নীচে—"

"আজ্ঞে জলের নীচে ত কোনদিন যাই নি; ওপরেই কাজ করেছি। এখন কি করে—?"

"তা হোক। তোমাকে যেতেই হবে। এখন যাও—"

আজ্ঞে, জলের নীচে ত কোনদিন যাই নি—

বিশু কাঁদ কাঁদ মুখ করে ক্যাপ্টেনের কামরা থেকে বেরিয়ে এল। ভয়ে তার মুখ এতটুকু হয়ে গেছে।

সেদিন থেকে বেচারার চোখের ঘুম উড়ে গেল। পেট ভরে খায় না। ক্যাপ্টেন আবার জানালেন, তিনদিন পরে আমরা জাহাজখানার কাছে গিয়ে পড়ব এবং সেই দিনই তাকে কাজে লাগ্‌তে হবে। জাহাজে সকলের মুখেই ঐ কথা—"ডুবোজাহাজ থেকে বিশু সোনা তুল্‌বে, জলের নীচে থেকে মুক্তা তুলে আন্‌বে—"

এদিকে জাহাজের কাজ কিন্তু যেমন চল্‌ছিল তেমনি চলছে।

সমুদ্রের নীচে ডুব দিয়ে থাকা খুবই কঠিন কাজ। সকলেই তা' পারে না। কেন না সেখানে যেমন ঠাণ্ডা তেমন অন্ধকার। দু'হাত দূরে কি আছে, দেখা যায় না। তার ওপর, যত নীচে যাওয়া যায়, জলের চাপ তত বাড়ে। ৫০০ শ' ফিট নীচে জলের চাপ অনেক। সে চাপ সহ্য করে সেখানে কিছুক্ষণ থাকে, এমন মানুষ নেই। কোন রকমে যদি ডুব দেওয়া যায়, তা' হলেও জলরাশি নীচে থেকে ঠেলা দিয়ে ওপরে তুলে দেবে। ডুবুরীদের পোষাক হয়ত [illegible] দেখা আছে। সে পোষাক ধাতুনির্ম্মিত ও খুব ভারি। তা' পরে খুব জোয়ান লোকও ডাঙায়

নড়তে পারবে না। কিন্তু জলের নীচে তা' সোলার মত হাল্‌কা। অবশ্য ডুবুরীদের পোষাক এক রকমের নয়, অনেক রকমের হয়ে থাকে।

কাজেই সকলে বুঝ্‌তে পারছেন, ডুবুরীর কাজ সহজ নয়—ওতে যথেষ্ট বিপদ আছে। অত ঠাণ্ডায় আর অত চাপে কতক্ষণ থাকা যায়? অনেক ডুবুরী গভীর জলের নীচে থেকে ওপরে উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কারো কারো নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বার হতে দেখা গেছে। মানুষের এমন অবস্থা হলেও সেখানে কি কোন প্রাণী নেই? কিছুকাল আগেও অনেকের ধারণা ছিল, গভীর সমুদ্রের তলা একেবারে প্রাণীশূন্য। এখন জানা গেছে, সেখানেও নানারকম প্রাণী আছে। মাছ, উদ্ভিদ, পোকা প্রভৃতি—কত রকমের, কত রঙ-বেরঙের। দেখ্‌লে মনে হবে, বুঝি পরীর দেশে এসে পড়েছি। সেখানে যে সব মাছ আছে, তাদের চোখ দু'টো হয় বড় বড়, যেন এক একটা দৈত্য। কোন কোন মাছের গায়ে আবার সারি সারি আলো জ্বলে। মনে করতে পারেন, মানুষকে যখন কঠিন বর্ম্ম এঁটে সেখানে যেতে হয়, মাছদের শরীরও বুঝি তেমনি কঠিন আঁশ বা খোলায় ঢাকা। কিন্তু তা' নয়। বরং আরও নরম তুলতুলে। অনেকের গায়ে

ডুবুরি

আঁশই নেই। শরীরটা পাত্‌লা। মাটির ওপর পড়ে থাক্‌লে মনেই হবে না যে, কোন প্রাণী সেখানে আছে।

তাদের গায়ের রঙেরই বা কি বাহার! কাট্‌ল মাছ, অষ্টপাশ, শঙ্কর মাছের নাম সকলেই জানে। ওদের গায়ে আঁশ কোথায়? অবশ্য তিমির গায়েও আঁশ নেই, তবে তিমি মাছ নয়। হাঙ্গরও আঁশহীন। কিন্তু ও দু'টো গভীর জলের প্রাণী নয়। তিমি বেশীক্ষণ জলে ডুব দিয়ে থাক্‌তে পারে না। তিমি-শিকারীদের ঐ একটা মস্ত সুবিধা। হারপুনের (ইলেক্‌ট্রিক বর্শা) ঘা খেয়ে তিমি জলে ডুব দেয় বটে, কিন্তু নিশ্বাস নেবার জন্যে আবার তাকে ওপরে উঠে আসতে হয়। তখন আর বেচারার নিস্তার থাকে না।

হাঙ্গরও থাকে জলের ওপর ভাগে। হাঙ্গর শিকার কেউ দেখেছেন? সে বড় মজার। আমাদের সেই জাহাজে এক-জন নাবিকের মুখে হাঙ্গর শিকারের অনেক গল্প শুনেছি। লোকটা নিজেই অনেক হাঙ্গর ধরেছে। তার একখানা ছোট নৌকো ছিল, তাতে চড়ে সে সমুদ্রে হাঙ্গর শিকারে যেত। জাল বা কঁ্যাচা দিয়ে নয়, শিকার করত হাত-সূতো দিয়ে! প্রায় পাঁচ শ' গজ লম্বা বেশ শক্ত ও মোটা হাত-সূতোতে মজবুত বঁড়শী বেঁধে তাতে টোপ গেঁথে জলে নামিয়ে দিয়ে সে চুপ করে নৌকোর ওপর বসে থাক্‌ত। তার সঙ্গী কেউ থাক্‌ত না। নৌকাখানা বাতাস ও ঢেউয়ে এক দিকে ভেসে চল্‌ত। চারদিকে সমুদ্র। দূরে কাল দাগের মত তীর।

কাছে কিনারে কেউ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূতোয় বেশ জোর এক টান্ পড়ত। আর যায় কোথা! তার পরই মানুষ ও হাঙ্গরে টানাটানি। সেই টানে নৌকো যেত ভেসে; কখন কখন বার সমুদ্রেও গিয়ে পড়ত। তখন বিপদের সম্ভাবনা থাক্‌ত খুব বেশী। শেষ কালে কিন্তু জয় হ'ত মানুষেরই। ক্লান্ত হাঙ্গরটাকে ক্রমে নৌকোর কাছে টেনে এনে তার মাথায় ছোট একটা মোটা লাঠির বাড়ি মেরে একেবারে কাবু করে নৌকোয় টেনে তুল্‌ত। এক একদিন সে চার পাঁচটা হাঙ্গর শিকার করত। হাঙ্গরের লিভারের তেল, গায়ের চামড়া বড় দরকারী। হাঙ্গর বেচে লোকটা দু'পয়সা রোজগার করত।

আবার কোন কোন দ্বীপের আদিম লোকেরা হাঙ্গর শিকার করে জলে নেমে কেবল ছোরা দিয়ে। তারা এমন সাঁতার-পটু যে, দেখলে তাক্ লেগে যায়। মনে হয়, যেন মানুষ-মাছ। লোকগুলোর ভয়-ডরও কিছু নেই। ছোরা হাতে হাঙ্গর ভরা জলে নির্ভয়ে নেমে গেল। যেই দেখলে হাঙ্গর আস্‌ছে, অমনি ডুব দিয়ে তার পেটের তলায় গিয়ে ছোরা দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিলে। কেউ কেউ আবার এমন আছে যে, নৌকার ওপর থেকে ছোরা হাতে হাঙ্গরের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে।

ছোরা দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিলে

কম জলে যে সব প্রাণী থাকে, বেশী জলে তারা যেতে পারে না। আবার গভীর জলের যারা, কম জলে এলে তারা মরে যায়। সাগরশশা আপনারা দেখেছেন? না দেখবারই কথা—এগুলো প্রাণী হলেও চীনারা খুব তারিফ করে খায়। কিন্তু চেহারা দেখ্‌লে বমি আস্‌বে। তারা-মাছ, স্পঞ্জ্‌, প্রবাল—এদের কথা আর কি বলব! কিন্তু মাঝ-সমুদ্রে প্রবালদ্বীপ অনেকেই দেখে থাক্‌বেন। প্রবাল দ্বীপ দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, প্রবাল জন্মেও বড় মজার কৌশলে। একটার গায়ে আর একটা, তার ওপর আর একটা—এমনি করে এই ক্ষুদে প্রাণীরা সমুদ্রের মধ্যে প্রবাল দ্বীপ গড়ে তোলে। ডাঙ্গায় যেমন প্রাণীর মেলা—সমুদ্রেও তাই। তবে তাদের বেশীর ভাগকেই আমরা কখনও দেখি নি, নামও শুনি নি। ডাঙ্গার ঘোড়া সকলেই দেখেছে। কিন্তু সমুদ্রের ঘোড়ার কথা ক'জনে জানে? সে ঘোড়াতে অবশ্য চড়া যায় না। তবে মারমেডের কথা একেবারেই মিথ্যা। আমি কেন, কেউ তা দেখে নি। আধামানুষ, আধা মাছ অমন সুন্দর প্রাণী নেই। থাকলে এতদিনে ধরা পড়তই। শাঁখ বেশী জলে থাকে। শাঁখেরা বড় ভয়ঙ্কর প্রাণী। জেলী মাছের নাম জানে না, এমন লোক খুব কমই আছে। মাছগুলো

সত্যিই জেলীর মত নরম। আর শাঁখের গা কেমন তা কাউকে বলে দিতে হবে না। ঝিনুকও থাকে গভীর জলে ;—কম জলেও বাস করে। ঝিনুকের পেট থেকে মুক্তো পাওয়া যায়। কিন্তু কি ভাবে মুক্তো থাকে হয়ত অনেকেই দেখেনও নি। সমুদ্রের সব জায়গায় অবশ্য মুক্তোওয়ালা ঝিনুক নেই। সকল রকম প্রাণীও সকল জায়গায় থাকে না। ঐ সব ঝিনুক ডুবুরীরাই তোলে। কিন্তু তাদের সকলেরই পোষাক থাকে না। যারা বিনা পোষাকে জলে নামে, তারা বাহাদুর নিশ্চয়।

একদিন আমাদের জাহাজের জন কয়েক লোক ম্যাকরেল মাছ ধরলে। ম্যাকরেল মাছ বোধ হয় অনেকেই খান নি। ভাজা খুব ভাল লাগে। ম্যাকরেল মাছ এক রকমের নয়। ছোট বড় নানা রকমের আছে। শুনলুম, ম্যাকরেল ঘণ্টায় নাকি চল্লিশ মাইলেরও বেশী সাঁতরে যেতে পারে। কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। তবুও মান্‌তে হবে। কেন না, যাঁরা ও খবরটা দিয়েছেন, তাঁরা কোন বিষয় ভাল করে না জেনে কথা বলেন না। আপনারা শোষক মাছ দেখেছেন? মাছগুলোকে দেখ্‌লে জোঁকের কথা মনে হয়। ওরা পরের গায়ে সেঁটে থাকে, আর, তার রক্ত শুষে খায়। মাছগুলোর মুখ আছে।

কিন্তু চোষে মাথার ওপরে জাফ্‌রী কাটা জায়গাটা দিয়ে। কখনও কখনও জাহাজের গায়েও শোষক মাছকে সেঁটে থাকতে দেখা যায়। সমুদ্রের যে অঞ্চলে শোষক মাছ দেখা যায়, সেখানকার অনেক লোকে আবার ঐ মাছগুলোর লেজে রিং ও দড়ি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিয়ে বড় বড় মাছ শিকার করে। এ সব ছাড়া তীরন্দাজ মাছ, জোনাকী মাছ, করাতী, তলোয়ারধারী মাছের নামও অনেকের শোনা আছে। তীরন্দাজরা চুপি চুপি ডাঙার কাছে গিয়ে বেশ টিপ করে জলের পিচকারী ছেড়ে পোকা-মাকড় ধরে। জোনাকী মাছ অন্ধকার সমুদ্রে নাকের ডগায় একগাছা শুঁয়ায় একটী আলো জ্বেলে ছোট ছোট পোকা-মাকড়কে তার কাছে টেনে আনে। বেচারারা আলো দেখে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আর ফিরে যেতে পারে না, জোনাকীর কুৎসিৎ হাঁয়ের মধ্যে তাদের সমাধি হয়। তলোয়ারধারীর তলোয়ারখানিও বড় কম ধারালো নয়। তার আঘাতে জাহাজও ছেঁদা হতে দেখা গেছে। আর কত রকম সামুদ্রিক প্রাণীর নাম করব? তাদের কি শেষ আছে? ইলেক্‌ট্রিকইল কেউ দেখেছেন কি? ওদের শরীরে ইলেকট্রিক তৈরীর ব্যবস্থা আছে, আর সে ইলেকট্রিকের এমন শক্তি যে, একটা ছোট খাট

প্রাণী তাতে মারা যেতে পারে। ছোঁয়াচ লাগ্‌লো এমন কি তার মানুষও বাঁচে না।

তারপর শুনুন ওদিকে বিশুর জলে নামবার আর মাত্র একদিন বাকী। জাহাজও অনেক দূর চলে এসেছে। বিশু রাতের বেলা অন্ধকার ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বল্‌লে—"মোহন, ক্যাপ্টেন যখন বলেছেন, তখন আমার নিস্তার নেই। বড় একগুঁয়ে লোক। কিন্তু কি করি বল ত?"

কি যে সে করবে, সে কথা প্রথমে আমার মাথায়ও এল না। চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে মনে হ'ল—বিশুর বদলে আমি নাম্‌লে কেমন হয়? বল্‌লুম,—"ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে বলি যে, তোমার বদলে আমি যেতে

বিশু হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে,—"খোকাবাবু, তুমি হাসালে। ও কি সোজা ব্যাপার!"

"দেখাই যাক্ না কি হয়। জলের নীচে কি আছে, যদি এই ফাঁকে একবার দেখে নিতে পারি—"

"না—না—না। ওসব কথা ভুলে যাও। আচ্ছা, যদি বলি অসুখ হয়েছে?"

"জাহাজের ডাক্তার তোমায় পরীক্ষা করবে—"

"যদি খুব যা-তা খেয়ে পেটের অসুখ বাধিয়ে ফেলি—"

"অসুখ নাও হতে পারে। সবটাই হয়ত হজম করে ফেলবে।"

"তবে উপায় ?"

"যা বল্‌লুম—"

"না—না—না—"

"আচ্ছা দেখা যাক্—" বলে নিজের কেবিনে শুতে এলুম। শুয়ে শুয়ে নানা রকম ফন্দী আঁটতে লাগলুম, কিকরে বিশুকে বাঁচানো যায়। ওর কি দোষ ? ওরকম বেফাঁস কথা অনেকেই ত বলে, তবে ও লোকটাই বা শাস্তি পাবে কেন ? ওকে বাঁচাতেই হবে।

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন গ্যাংওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে পাইপ টান্‌ছেন। আমি এক সেলাম করে সামনে দাঁড়ালুম। তিনি আমাকে দেখ্‌লেই ঘুষি উঁচিয়ে বল্‌তেন—"Come on fight."

আমার সেলামের উত্তরে আমার পাঁজরায় একটা ঘুষি মেরে বল্‌লেন,—"Come on."

বল্‌লুম—"স্যর, আমার একটা প্রার্থনা আছে—"

ক্যাপ্টেন বল্‌লেন—"কিন্তু আমি ঈশ্বর নয় বলে

রাখছি”—বলে আমার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন।

বল্‌লুম—“স্যর, বিশুর বদলে আমাকে সোনা তুল্‌তে নামিয়ে দিন।”

“কি ?”

“বিশুর বদলে আমি—”

ক্যাপ্টেন হো হো হো করে হাসতে লাগলেন। “তুমি ? ক' দিন জাহাজে এসেছ ? কি জান ? হো—হো—হো—আচ্ছা। কিন্তু বিশুকে বলো না, ওকে অন্য ভাবে জব্দ করব। তুমিই যাবে, আমাদের প্রফেসরের সঙ্গে। উনি এক ঘর তৈরী করেছেন। তা'তে দু'জন ধরে। তোমার সাহসে বড় খুসী হয়েছি। এই ত চাই। খবরদার কাউকে বলো না—কাল। বুঝ্‌লে ?” বলে ক্যাপ্টেন পাইপ টান্‌তে টান্‌তে চলে গেলেন।

আমার তখন এত আনন্দ হল যে, ইচ্ছে করছিল, সমুদ্রের নীল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউয়ের মাথায় উঠে দোল খাই।

বাস্তবিক সেখানে যে কোন ডুবোজাহাজ ছিল তা নয়। প্রফেসর মহাশয় জলের তলে কি আছে দেখ্‌তে ও সেখানকার ফটো নিতে যাচ্ছিলেন। জলের যত নীচে

যাওয়া যাবে ততই অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসবে, একথা আগেই বলেছি। তার ওপর রক্ত জমানো ঠাণ্ডা। আবার কোথাও কোথাও বিষাক্ত গ্যাসও ওঠে।

পরদিন আলো হতেই জাহাজে সাড়া পড়ে গেল। বিশু বেচারার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। আমি হাসি চাপতে পারি না, আবার তার অবস্থা দেখে দুঃখও হয়। ক্যাপ্টেন বিশুকে ডেকে পাঠালেন। তার পিছনে পিছনে আমরাও মজা দেখ্‌তে গেলুম। বিশু তাঁকে সেলাম করে দাঁড়াতেই তিনি বল্‌লেন,—"তুমি প্রস্তুত ?"

বিশু কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লে,—"আজ্ঞে কর্ত্তা, কাল থেকে আমার পেটের—"

"বেশ। শুয়ে থাক গে। ডাক্তার ওষুধ দেবেন। তাঁর কথামতই তোমাকে খেতে দেওয়া হবে। যাও—দেরী করো না।"

মুখ দেখে বুঝ্‌লুম, এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে সে মনে মনে বেজায় খুশী হয়ে উঠেছে। এক রকম ছুটেই সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেচারা যদি জানত তার কপালে কি আছে !

এদিকে এই ব্যাপার চল্‌লেও আর এক দিকে প্রফেসরের তৈরী লোহার ঘরখানা নামাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল।

বিশু চলে গেলে ক্যাপ্টেন আমাকে নিয়ে সেখানে গেলেন। প্রফেসর আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন,—"আমার আর ভয় নেই। তোমার মত একটা ষণ্ডা ছোকরা আমার সঙ্গে থাক্‌লে, সমুদ্রের সব জানোয়ারকে মেরে ফেলব।"

তার পর সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেলে আমরা সেই ঘরে ঢুকে পড়্‌লুম। ছোট দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তার মধ্যে একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তেই ঘরটা আমাদের নিয়ে আস্তে আস্তে জলে ডুবতে লাগ্‌ল। যত নীচে যাই আলোর তেজ ক্রমে কমে আসে। মনে হতে লাগ্‌ল, দিনের আলো ধীরে ধীরে নিবে আস্‌ছে; ঠাণ্ডাও একটু একটু করে বাড়ছে। শেষে আমরা যখন হাজার ফুট নীচে একেবারে মাটিতে নেমে পড়্‌লুম তখন খুব ঠাণ্ডা। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। আমাদের অমন তেজী ইলেকট্রিক আলোটাও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। তার আলোয় বেশী দূর দেখা যায় না। কোথাও সাড়া-শব্দ কিছু নেই; একদম সব চুপ্‌ যেন এক বিশাল ঘুমন্ত পুরী। মনে করেছিলুম, সেখানে বরুণ রাজার বিরাট মণিময় প্রাসাদ দেখতে পাব। দেখ্‌ব, মণিমুক্তার মুকুট মাথায়, গলায় রক্তপ্রবালের মালা ঝুলিয়ে বরুণ রাজা স্ফটিকের

সিংহাসনে বসে আছেন। কিন্তু তার বদলে একি? আমাদেরই লোহার ঘরের গায়ে জানালার বাইরে নানারকম মাছ এসে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। তাদের চলা-ফেরায়ও চোখে কৌতূহল। ভাবছে এ আবার কারা? কোথাকার প্রাণী? কেউ কেউ আবার দূর থেকে ডানা দুলিয়ে, লেজ বেঁকিয়ে রঙের বাহার তুলে অবজ্ঞা ভরে চলে যাচ্ছে। এক জায়গায় দেখলুম, ছোট ছোট গাছ-গাছড়া, তাতে নানা রঙের মাছ ও ফুল। একটা কাটল মাছ কতকগুলো গাছের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ প্রফেসার বল্‌লেন—"দেখ, দেখ—"

তাকিয়ে দেখি, একটা অকটোপাস ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা। জন্তুটা চল্‌ছিল ওর পায়ের গায়ে যে সব গর্ত্ত আছে তাই থেকে খুব জোরে জল ছাড়তে ছাড়তে। ওদের চলার রকমই ঐ। ডানা নেই, লেজ নেই, সাঁতার কাটবে কি দিয়ে? তাই ওর মুখগুলো জল টেনে নেয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে কুলকুচোর মত জল বার করে দেয়। সেই জলের ধাক্কায় রয়ে রয়ে চল্‌তে থাকে। তাই বলে মনে করবেন না ওরা খুব আস্তে চলে। কাটল মাছ আর অক্টোপাশের চেহারা যেমন কুৎসিৎ ওদের প্রকৃতিও তেমনি মোটেই ভদ্র নয়। ওরা আবার

কোন শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময় এক রকম কাল্‌চে রঙ—এই রঙে সিপিয়া কালি তৈরী হয়—জলে ছড়িয়ে দিয়ে তার আড়ালে গা ঢাকা দেয়। এ যেন চোখে ধূলো দিয়ে কোন সয়তানের পলায়ন। তাই নয় কি?

প্রফেসার জায়গাটার ও অক্টোপাশটার একখানা ছবি তুলে নিলেন। কয়েকটা বড় বড় মাছও আমাদের ঘরের কাছে এল। প্রফেসার তাদেরও ফটো তুললেন। থারমোমিটারে জায়গাটার তাপ ও একটা যন্ত্রের সাহায্যে স্রোতের গতি পরীক্ষা করে বল্‌লেন—"মোহন, মনে কর, আমাদের আর ওপরে ওঠবার উপায় নেই। এখানে থাক্‌তে পারবে?"

"নিশ্চয়ই"

"বটে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। জায়গাটার চারিদিক থেকে বিষাক্ত গ্যাস উঠ্‌ছে। ঐ দেখ, মাছগুলো তাই পালাচ্ছে—"বলেই তিনি ওপরে খবর পাঠালেন—"তোল—"

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরখানা ওপরে উঠতে লাগল। জলের ওপরে উঠেই দেখি সকলে উৎসুক হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনটা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে

বিজ্‌লী মাছ
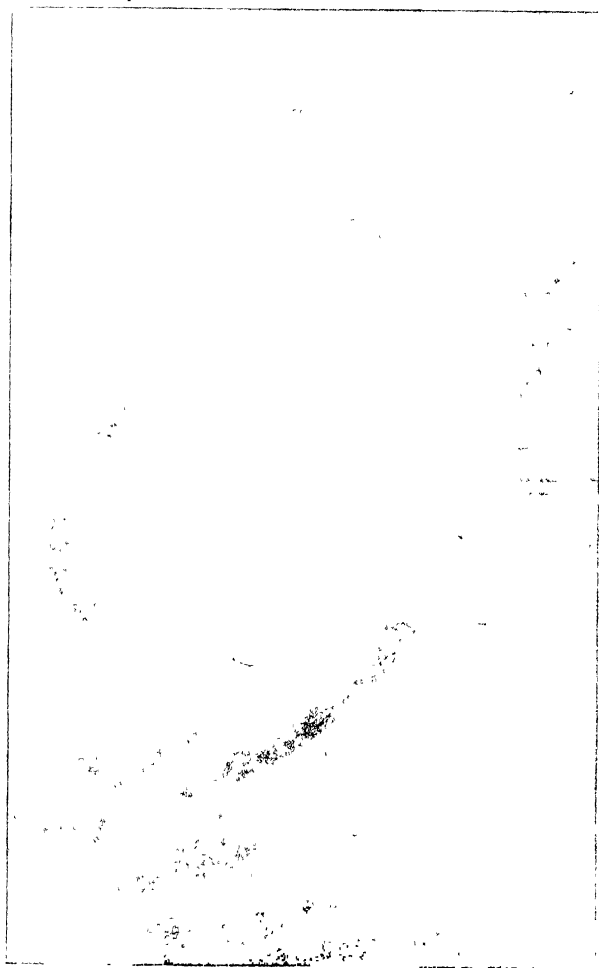
আছে। সে দৃশ্য কিছুতেই ভুল্‌তে পারব না। ক্যাপ্টেন সেইদিন আমায় একটা চাকরী দিলেন।

কিন্তু বিশু বেচারার দুর্দ্দশা সুরু হ'ল। ডাক্তার সে বেলা ত তাকে কিছু খেতে দিলেনই না, বিকেলেও তার ব্যবস্থা হল আধ পোয়া আন্দাজ জল-বার্লি। ক্ষিদের জ্বালায় সে ছটফট করতে লাগল। ওষুধও দিলেন এমন ঝাঁঝালো যে গিল্‌তে তার চোখ-মুখ-নাক দিয়ে জল বেরিয়ে এল। সকলে আসে আর একবার করে তাকে দেখে যায়। যাবার সময় বলে—"আহা! বিশুর বড় অসুখ!" শেষে বিশু কেঁদে ফেল্‌লে। কথাটা ক্যাপ্টেনের কানে যেতেই তিনি ডাক্তার সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। তার খানিকক্ষণ পরেই দেখি বিশু রাক্ষসের মত মাংস, রুটি আর গরম চা গিল্‌ছে। সেদিন থেকে বিশুর ফাঁকা কথা কিছু যেন কম হয়ে এল। এই ঘটনার বৎসর খানেক পরেই সে অন্য জাহাজে বদলী হয়ে যায়। তারপর চাকরী ছেড়ে বাড়ীতেই কিছুকাল ছিল। শেষে তার এক ভাইয়ের সঙ্গে রেঙ্গুণ না কোথায় সেই যে গেল আর আসে নি। সেখানে সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানিনা। না বাঁচবারই কথা। কেন না হিসাব করলে তার এখন বয়স হবে আশী বছর।

সেখান থেকে আমরা আবার চল্‌তে লাগলুম। কথা

ছিল, পরদিন এক বন্দরে পৌঁছব। কিন্তু রাত তিনটের সময় বেতারে খবর পেলুম দেড়শ মাইল দূরে একখানা জাহাজে আগুন লেগেছে। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন জানাচ্ছেন "বাঁচাও।" তৎক্ষণাৎ সেই দিকে জাহাজের মুখ ঘোরানো হল। আমরা পূর্ণ গতিতে সেদিকে চল্‌তে লাগলুম। ক্রমে সকাল হয়ে এল। চারিদিকে গাঢ় কুয়াশা। যথাসম্ভব সাবধানে তার মধ্যে দিয়ে চলেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হয়, এই বুঝি কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গেল। যখন প্রায় একশ মাইল পার হয়ে গেছি, দেখি, মাথার ওপর দিয়ে তিনখানা বড় বড় উড়োনৌকো ভোঁ ভোঁ শব্দে সেই দিকে উড়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে বেতারে আমাদের কথা হ'ল। তারা বল্‌লে—"আমরাও খবর পেয়েছি।"

তারপর আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলুম দেখলুম, সমুদ্রের জলে চারিদিকে ঢেউয়ের মাথায় কাপড়, টুপী, লাঠি, বিছানা, কাঠ, লাইফবেল্ট কাগজ ইত্যাদি অনেক জিনিষ ভাসছে। একখানা প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজ ও মেল জাহাজ আস্তে আস্তে দুদিকে ফিরে যাচ্ছে। তারা জানালে, "পোড়াজাহাজ-খানা ডুবে গেছে। তার লোকগুলো প্রায় সকলেই বেঁচেছে। কেবল বেতারকারী ও একজন যাত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে

না। খুব সম্ভব তারা ডুবে গেছে।” জাহাজ দুখানার কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলুম, উড়োনৌকোগুলোর কাছ থেকে কোন সাহায্য নেবার দরকার হয়নি। তারা সেখানে মাথার ওপর বার কয়েক ঘুরপাক দিয়ে ব্যাপারটা দেখেই তীরের দিকে উড়ে গেছে। অগত্যা আমরাও ফিরে চল্‌লুম।

আমার জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। সমুদ্রে আরও কত কি দেখেছি। সে সব একদিনে ও অল্প কথায় শেষ হবে না। যদি জানবার ইচ্ছে থাকে আমায় জানালে আমি একে একে সব বল্‌ব। পরীর গল্পের চেয়েও সে সব সুন্দর। আজ এইখানে শেষ করছি, নাহলে এঁদের দুজনের গল্প শোনা হবে না।

আমি এখন জাহাজেই খুব বড় একটা কাজ করি। যতদিন না মরি জাহাজেই থাক্‌ব, সাত সমুদ্রে ভেসে বেড়াব, আর, সেখান থেকে দেশের সকলকে ডাকব “এস—এস—এস।” বলে মোহন চুপ করলেন।

প্রতাপ বল্‌লেন “এ সব শুনে আমার কথা আর বল্‌তে ইচ্ছে হয় না। সে সব মাটির নীচের ব্যাপার। বল্‌তে বল্‌তে হয়ত গল্পটা মাটি হয়ে যাবে। তবুও বলি—”

# প্রতাপের গল্প

মানভূম জেলায় আমার এক আত্মীয় থাকতেন। তিনি কাজ করতেন এক কয়লার খনিতে। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল খনির ব্যাপার সব জান্‌তে হবে। কি করে কয়লা, হীরে, সোনা, লবণ প্রভৃতি খনি থেকে তোলা হয়? এ সব ছাড়া লোহা, রূপো, অভ্র, সিসে প্রভৃতিও খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সব খনি ত এক সঙ্গে দেখা সম্ভব নয়। আবার সব দেশে সব জিনিষ পাওয়াও যায় না। কাজেই দেশে যেটা আছে সেটার বিষয় কিছু আগে জানা যাক্। এই ভেবে ঠিক করলুম, আমার সেই আত্মীয়টির কাছে যাব। সেকথা জানিয়ে তাঁকে একখানা চিঠিও দিলুম। কিন্তু সেইদিনই দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ী এসে হাজির! আমার সঙ্কল্প শুনে প্রথমে উৎসাহ দিলেন না। শেষে আমার খুব আগ্রহ দেখে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

তিনি যেখানে কাজ করতেন, জায়গাটা রেলষ্টেশন থেকে বারো মাইল দূর। ও সব অঞ্চলে যদি গিয়ে থাকেন দেখেছেন বোধ হয়, মাটি কাঁকুরে ও লাল; জমী উঁচু-নীচু। এখানে সেখানে ছোট ছোট পাহাড়, বড় বড়

শালবন আছে। সেই বন ভেদ করে পাহাড়ের ধার দিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে বড় বড় রাস্তা এদিকে ওদিকে চলে গেছে। কোনটা কুড়ি মাইল, কোনটা চল্লিশ, আবার, কোনটা বা দশ মাইল লম্বা। ঐ সব বন-জঙ্গলে চিতাবাঘ ও ভাল্লুকও যে দেখা যায় না, তা নয়। আকাশ সব সময়ই কয়লাখনির চিম্‌নীর ধোঁয়ায় মলিন। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখায় মন্দ নয়।

তখন শীতকাল। আমরা দুজনে একদিন সন্ধ্যার একটু আগে সেখানকার ছোট ষ্টেশনটিতে এসে ট্রেন থেকে নামলুম। আমাদের সঙ্গে আরও জনকয়েক যাত্রী নাম্‌ল। তারা যাবে আশ-পাশের খনিগুলোতে। সেগুলোও ষ্টেশন থেকে সাত আট মাইল দূরে হবে। সেদিকে দুখানি মোটরবাস সকাল-সন্ধ্যায় এইসব খনির যাত্রী নিয়ে ট্রেনের সময়মত যাওয়া-আসা করে। কিন্তু নেমেই শুনলুম, একখানি বাস দুপুর থেকে একদম বিকল হয়ে ষ্টেশনের বাইরে পড়ে আছে।

রাতের মধ্যে তার আর চাঙ্গা হয়ে ওঠবার উপায় নেই। বাকীখানিও সেই ভাঙ্গাবাসের যাত্রী নিয়ে এখনও ফিরে আসতে পারে নি। তবে তার আসবার সময় হয়েছে; এল বলে।

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে ষ্টেশন প্ল্যাটফরমেই অপেক্ষা করতে লাগলুম। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তরে গেল। তবুও তার দেখা নেই। সকলেই উৎকণ্ঠীত। অন্য সময় হলে কথা ছিল না। শীতকাল, তার ওপর এদেশে শীতও পড়ে খুব প্রখর। এই ত ছোট ষ্টেশন। সকলে একটু যে বসবে তারও জায়গা নেই। যদি বাস না আসে তাহলে? এই সব কথার আলোচনা হচ্ছে; রাতও একটু বেড়ে গেছে, এমন সময় বাসখানা ভোঁ ভোঁ করতে করতে এসে হাজির।

খালি হতে নাহতেই আমরা মোট-ঘাট নিয়ে তাতে চড়ে বস্‌লুম। বারো মাইল রাস্তা দেখতে দেখতে পার হয়ে যাব। ঐ ত চারিদিকে খনিগুলোর উজ্জ্বল আলো ও কাঁচা কয়লা পোড়ানর আগুন দেখা যাচ্ছে। দেরী করবার ইচ্ছে থাকেলেও যাত্রীদের হাঁকডাকে আসবার প্রায় আধঘণ্টা পরেই বাসখানা ছেড়ে দিল।

অন্ধকার রাত। সে পথের কোথাও গ্যাস, ইলেকট্রিক বা কেরোসিনের আলোও নেই। দুধারে জনমানবের বসতি শূন্য উঁচু-নীচু মাঠ। তার ওপর গাঢ় অন্ধকার জমে আছে। বাসের খুব জোর হেডলাইট সেই অন্ধকার চিরে পথ চিনে চল্‌ছে। ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক পার হয়েই একটা

বাঘটা হেডলাইটের দিকে মিট্‌ মিট্‌ করে তাকাচ্ছে
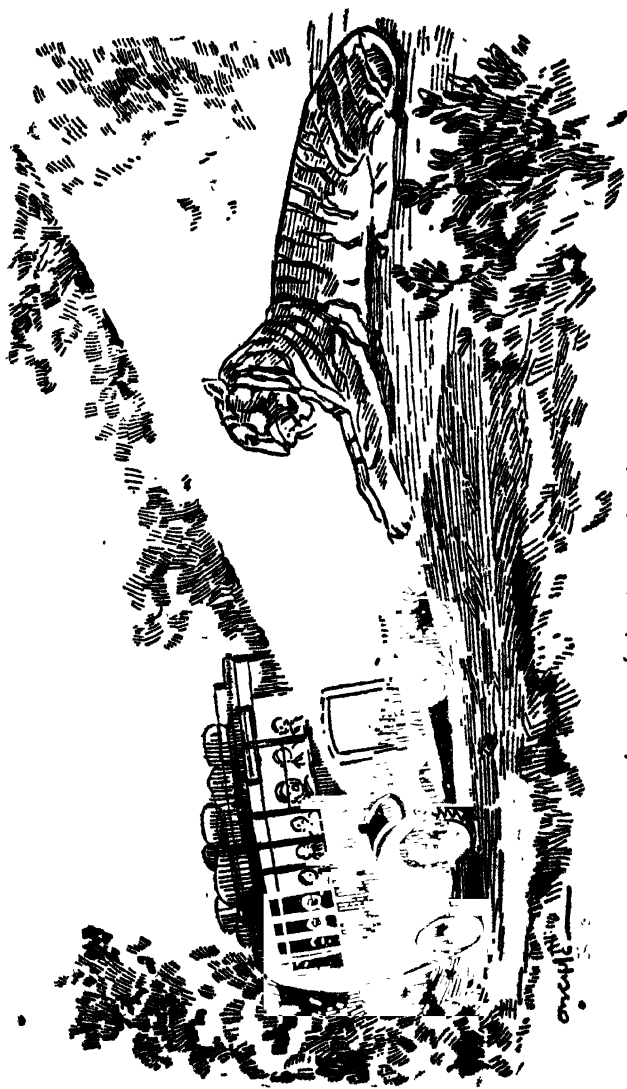
শালবন পড়ল। পথটাও সেখানে ক্রমে ওপর দিকে উঠেছে। শুনলুম, বনটা বেশী বড় নয়, লম্বায় মাত্র ক্রোশ দেড়েক, চওড়ায়ও হবে ক্রোশখানেক। তবে পর পর কয়েকটা চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গতে হয়। আমাদের বাসখানা বনের মধ্য দিয়ে প্রথম চড়াই পার হয়ে দ্বিতীয় চড়াইয়ে ওঠবার সময় হঠাৎ ড্রাইভার ও সামনের বেঞ্চির দুজন যাত্রী চীৎকার করে উঠ্‌ল—"বাঘ-বাঘ।"

সকলে তৎক্ষণাৎ সভয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি একটা ডোরাদার বাঘ! বাঘটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঠিক চড়াইয়ের মাথায় শুয়ে বাসের হেডলাইটের দিকে মিট্‌ মিট্‌ করে তাকাচ্ছে। তার গোঁফ জোড়া একটু নূয়ে পড়েছে। ড্রাইভার খুব জোরে হর্ণ বাজাতে লাগ্‌ল। কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন ছিল, তেমনি পথ আগ্‌লে বসে রইল। তার রকম দেখে ড্রাইভার বল্‌লে "যদি না ওঠে ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে বাস চালাব"—বলে আরও ঘন ঘন হর্ণ বাজাতে লাগ্‌ল। এবার ব্যাঘ্রমশায়ের যেন একটু চেতনা হ'ল। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাসখানাও ততক্ষণে তার কাছে এগিয়ে এসেছে। তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে আর কি। গতিক সুবিধা নয় দেখে ব্যাঘ্রমহাশয় এক লাফে বনের অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন।

অমনি চোঁ করে একটা টায়ার ফেটে গেল। মনে হল, সেই সঙ্গে সকলেরই মন গেল চুপসে। এখন উপায়? এ ব্যাপারে বাঘের মনে কি হচ্ছিল জানি না। ড্রাইভার ত গালে হাত দিয়ে ষ্টিয়ারীং ধরে চুপ করে বসে রইল। এই অন্ধকারে কোথাও যদি বাঘটা ওৎ পেতে বসে থাকে? নতুন টায়ার পরাবার সময় সে কি তার অপমানের শোধ নেবে না? বাঘের রক্ত একটুতেই গরম হয়। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে সেই গহন বনে সারারাত বসে থেকেই বা লাভ কি? কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভার বল্‌লে—"আপনারা সকলে এক সঙ্গে প্রাণপণে চীৎকার করুন, হাত তালি দিন, বাক্স-পেঁটরা ও বাসের গা বাজান, বাসের ওপর ধুম ধুম করে নাচুন আর আমি হর্ণ বাজাই। বাঘটা যদি আশ পাশে কোথাও এখনও থাকে, এ শব্দে নিশ্চয় পালাবে। সে না পালালে টায়ার পরানো যাবে না। টায়ার না পরালে গাড়ীও চল্‌বে না—"

আমার আত্মীয়টি বল্‌লেন—"এ সব নাহয় করা গেল। কিন্তু বাপু, বাঘটা তবুও দূরে সরে গেল কি না কি করে বুঝবে?"

"এত গোলমালে কি বাঘ স্থির থাকতে পারে মশায়?

"বেশ। আসুন মশায়রা চেঁচানো যাক্—"তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সকলে চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, বাস বাজিয়ে, নেচে-গেয়ে যে কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌লে তাতে বাঘ কেন, সে বনে যত প্রাণী ছিল সবই বোধহয় তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে বন থেকে সরে পড়েছিল। হয়ত তাদের মনে হয়েছিল, এ বনে বাস করা আর তাদের ভাগ্যে নেই, কোন এক ভয়ঙ্কর নতুন জানোয়ারের আমদানী হয়েছে।

এদিকে কিছুক্ষণ চীৎকার ও লাফালাফি করে সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমার আত্মীয়টি ড্রাইভারকে বল্‌লেন "বাপু, এবার নেমে টায়ারটা বদলে ফেল—"

ড্রাইভার বল্‌লে—"কেবল আমাকে নামলে হবে না, আপনাদেরও সকলের নামা চাই—"

"কেন?"

"নাহলে যাত্রী বোঝাই গাড়ী জ্যাকে তোলা সহজ হবে না—"

তখন সকলেরই মুখ চুন—যদি বাঘটা এখনও সেখানে থাকে? প্রত্যেকেই ভাব্‌ছে সেই বাঘের মুখে যাবে। ড্রাইভার বললে—"ভয় কি মশায়রা, আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সকলে আবার চীৎকার করুন। আমি সেই ফাঁকে টায়ারটা বদ্‌লে ফেলি—"

তার কথা শুনে একজন বলে উঠ্‌ল—"লোকটা ত বেশ চালাক! ওকে আমরা ঘিরে দাঁড়াব?"

কিন্তু তা ছাড়া উপায় কি? টায়ার পরাবে কে? ভাড়া দিয়ে গাড়ীতে উঠে শেষে তার চাকা ঠেলতে হবে? অগত্যা ভয়ে ভয়ে সকলকে নেমে লোকটাকে ঘিরে দাঁড়াতে হ'ল। ড্রাইভারও ক্ষিপ্র হাতে টায়ার পরাতে লাগল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই টায়ার পরানো হয়ে গেলে আবার আমরা সেই বনের মধ্য দিয়ে চল্‌তে লাগলুম।

প্রথমেই এই কাণ্ড! ভাবলুম এর পর কপালে কি আছে কি জানি। কিন্তু আর কিছু হ'ল না। বন পার হয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে চড়াই-উৎরাই ভেঙে আমরা নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়্‌লুম।

খনির একধারে আমাদের বাড়ী। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার আত্মীয়টি কাজে বেরিয়ে গেছেন। আমি খনির এদিক-ওদিকে বেড়াতে লাগলুম। এ খনিটার গভীরতা মাত্র তিন শ ফিট। চারিদিক কয়লায় কালো হয়ে আছে। আকাশও ধোঁয়ায় মলিন। কুলিরা কাযের পাকে আসা-যাওয়া কর্‌ছে। চারিদিকেই ব্যস্ততা। সুড়ঙ্গ-পথে নীচে থেকে ক্রেণে ছোট ছোট ট্রাক বোঝাই হয়ে কয়লা উঠ্‌ছে। হাত খানেক ফাঁক সরু লাইন। তার ওপর

কয়লা বোঝাই বা খালি ট্রাকের সারি। সেগুলোকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে একখানা ক্ষুদে এঞ্জিন লাইনের একধারে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করছে ঠিক যেন একটা হাতীর বাচ্চা! তবে শুঁড়টা উঠেছে ওপর দিকে। ঘরের একটা ছাড়া আর সব দরজা-জানালা বন্ধ করে কিছুক্ষণ থাকলেই হাঁফিয়ে উঠি। এ ত মাটির নীচে! যারা খাদের মধ্যে কাজ করছে তারা দম আটকে মারা যায় না? বড় আশ্চর্য্য ঠেকল। দেখলুম, খনির মুখ ও একটা। ওখানে বাতাস চলাচল করে কি করে? একটা মাত্র মুখ হলে তার সম্ভাবনা ছিল বৈকি। কিন্তু অন্য দিকে আরও একটা মুখ যে আছে সেটা তখনও দেখি নি। সব খনিরই দুটো মুখ থাকে। দুই মুখ দিয়ে বাতাস চলাচল করে, তাই নীচের লোকদের নিশ্বাস নেবার অসুবিধা ঘটে না। আমার ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল একবার নীচে নামি; কিন্তু তার কোন উপায় না দেখে সেখান থেকে কিছুদূর দাঁড়িয়ে লোকজন ও কয়লা ওঠা-নামা দেখতে লাগলুম।

আপনারা জানেন বোধ হয়, কয়লার খনি ওপরে খুব বড় না দেখালেও নীচে লম্বা-চওড়ায় বড় কম নয়। দু এক ক্রোশ ত বটেই; কোনটা লম্বা-চওড়ায় তার চেয়েও বেশী। খনির নীচে খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম

নয় এই ওপরের মতই গরম ঠাণ্ডা। তবে একটু স্যাঁৎ-স্যাঁতে লাগে!

আমি ত তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, আমার আত্মীয়টি ক্রেণে চড়ে ওপরে উঠলেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হে, তুমি একা দাঁড়িয়ে কি করছ? দেখ্‌ছ সব?"

"হ্যাঁ—"

"নীচে যাবে?"

ঘাড় নেড়ে জানালুম—হাঁ—"আচ্ছা, দাঁড়াও আমি একটু কাজ সেরে আসি—" বলে তিনি অফিসের দিকে চলে গেলেন। তার খানিক পরেই ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই ক্রেণে বাঁধা লোহার খাঁচায় উঠলেন। অমনি ধীরে ধীরে ক্রেণ নামতে লাগল। নামবার সময় সারা শরীরে বেশ একটা শিহরণ বোধ হতে লাগল। নীচে নেমে প্রথমে চোখে ত কিছুই দেখতে পাইনা। মর্ত্ত থেকে পাতালে এসেছি, সেখানে সূর্য্যের আলো কোথা পাব? এ সব জায়গায় সাপ, ইঁদুর, কেঁচো, ঘুরঘুরে পোকাদেরই বাস করা পোষায় যদিও এত নীচে তারা থাকে না। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতে দেখি, আমার সমুখে একটা পথ। তবে লাইন পাতা;

তার ওপর দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে কয়লা বোঝাই ছোট ছোট ট্রাক আসছে। আমরা সেখান থেকে আর একদিকে চল্‌তে লাগলুম।

দুপাশে ও মাথার ওপরেও কয়লা। ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়ছে। এই জল আবার একজায়গায় গিয়ে জমা হবার জন্য পথের ধারে সরু নর্দ্দমা। সেখান থেকে জলটাকে পাম্প্ করে ওপরে তুলে ফেলা হয়। আমার আত্মীয়টি বল্‌লেন—"সব খনিতেই এ রকম জল পড়ে না, কোনটা খট খটে শুক্‌নো। আবার কোনটার কোথাও শুক্‌নো, কোথাও এমনি স্যাঁৎসেঁতে—দেওয়াল ও ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে।"

বললুম—"যেগুলো ভিজে সেগুলোতে আগুন লাগে না নিশ্চয়ই ?"

"লাগে বৈ কি। এই ত আমাদের খনি থেকে আঠারো মাইল দূরের এক খনিতে ভয়ানক আগুন লেগেছিল। ওঃ কতদিন ধরে তা পুড়েছিল !"

একটু ভয় হ'ল যদি এখানেও এই মুহূর্ত্তে আগুন লাগে ? ঐ ত কাটুনীরা সেফটি ল্যাম্প জ্বেলে গাঁতি দিয়ে কয়লা কাটছে। ঐ আলোর আগুন যদি লঙ্কাকাণ্ডের মত একটা কয়লাকাণ্ড বাধায় ! কিন্তু আগুন লাগাটা

তেমন সহজ নয়। মানুষের বুদ্ধির কাছে সবাই বশ। তবে অসাবধানতা বা দৈবাতের কথা আলাদা। কিন্তু দুর্ঘটনা কি অনবরতই ঘটে? ভয় কি?

আমি তাঁর সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম। তিনি বল্‌লেন "এরা গাঁতি দিয়ে কয়লা কাটছে? অনেক খনিতে এক রকম ইলেকট্রিক যন্ত্র সাহায্যে কয়লা কাটা হয়। সেখানে তুমি কয়লার গুঁড়োর চোটে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারবে না। ভাবছ, তবে তারা কাজ করে কি করে? সে ব্যবস্থাও আছে। ওপর থেকে সুড়ঙ্গপথে হাওয়ার ঝাপ্টা দিয়ে সেই ধূলো উড়িয়ে দেওয়া হয়। চল, আজ ফেরা যাক্। আবার কাল—"বলে তিনি ফিরতেই খনির একদিকে খুব গোলমাল শোনা গেল—"চোর!"

অবাক্ হয়ে গেলুম। মাটির নীচেও চোর? এখানেও পাহারাওয়ালার দরকার? পাতাল শুনেছি নাগের রাজত্ব। নাগরাজ কি গাঁতির আওয়াজে সিংহাসন ছেড়ে সপরিবারে ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে পলায়ন করেছেন? নাহলে এখানেও চুরি? ওদিকে গোলমাল ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেইদিকে চলতে লাগলুম।

ব্যাপারটা ঘটেছিল একেবারে পথের শেষে। গিয়ে দেখি, একটা ভূতের মত কাল ও ষণ্ডাগোছের লোক হাতে

গাঁতি, দাঁড়িয়ে আছে। আর, তাকে ধরে আছে জনকয়েক কাটুনী।

আমরা যেতেই তারা বল্‌লে—"ঐ পাশের খনি থেকে এসে পড়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে অফিসে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। লোক এল, খনির প্ল্যান এল। মিলিয়ে দেখা গেল আমাদের খনির সীমানার হাত দশেক কয়লা ওরা কেটে নিয়েছে। কতখানি কয়লা বলুন দেখি? আমারই ইচ্ছে করছিল, লোকটাকে ঘা কতক বসিয়ে দি। কিন্তু মনের রাগ মনে চেপে ফিরে এলুম।

তারপর থেকে একটু একটু করে খনির কাজ শিখতে লাগলুম। সেই খনিটা এখন আমারই ব্যবস্থায় চলে। কিছুদিন আগে গিয়েছিলুম সোনার খনি দেখ্‌তে! সময় থাকলে সেখানকার কথাও বলতুম। ফিরবার পথে কলম্বোটা দেখে দেশে ফিরে যাচ্ছি। ভালই হ'ল, আপনারাও ঐ দিকে যাবেন;—এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। সুবিধা হলে আরো নানারকম খনির গল্প বলব" বলে ভদ্রলোকটি অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

## সামন্তর গল্প

তিনি থামতেই সামন্ত বলতে সুরু করলেন— "অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাপখানা খুললেই দেখা যায় ওর সমুদ্রের ধারেই যত বড় বড় শহর, গ্রাম ও মহকুমা শহর। দেশটার মাঝখানটা প্রায় ফাঁকা। দেখে মনে হয়, এক চাকা পাঁউরুটির চারধারে কালো কালো পিঁপ্ড়ে ধরেছে। এমন হবার কি কারণ জানেন? ওর মাঝখান জুড়ে প্রকাণ্ড এক মরুভূমি। জল না হলে কোন প্রাণী বাঁচে? তাই কোন লোকালয়ও ওখানে নেই, লোকালয় নেই বলে কি লোক একেবারেই নেই? কেউ সে পথে যাওয়া-আসা করে না? করে। মানুষের গতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র; সে আকাশেও উড়ছে, পাতালেও ঘুরছে। অনেক দিন আগে হতেই ঐ মরুভূমির মধ্যে লোকে ঘোরাঘুরি সুরু করেছে। কিন্তু কারা জানেন? যারা খুব অনুসন্ধিৎসু। দেশটার কোথায় কি আছে, কেমন দেখ্তে এই সব কথা জানতে শত বাধা তুচ্ছ করে, প্রাণ হাতে নিয়ে তারা ঐ মরুভূমির মধ্যে গেছে। কেউ কেউ আর ফিরে আসে নি! সেই নির্জ্জন প্রদেশে কত কষ্ট পেয়ে মারা গেছে।

## আকাশ-পাতাল

কাজের সন্ধান করতে করতে আমি হঠাৎ এক মাল-জাহাজে চাকরী পাই। জাহাজখানা যাচ্ছিল অষ্ট্রেলিয়ায়। ওখানকার ক্রিকেট খেলোয়াড়, কন্‌ডেন্‌স্‌ট্‌ মিল্ক, ঘোড়া ও কমলালেবু প্রভৃতি দেখে অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল দেশটা একবার দেখ্‌তে হবে। ওখানে সোনার খনিও আছে। শুনেছিলুম, মরুভূমিরই কোন্ এক জায়গায় চন্দ্রকান্তমণিও পাওয়া যায়। ইচ্ছা-পূরণের একটা সুযোগ পাওয়া গেল দেখে মনের আনন্দে নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাজে উঠে রওনা হলুম।

পথের কথা কি বল্‌ব? আপনারা সকলেই সমুদ্রে যাতায়াত করেছেন। পথে কোথাও ঝড়বৃষ্টি পেলুম না। বেশ নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট তারিখে ফ্রীম্যান্‌ট্‌ল্ বন্দরে এসে জাহাজ লাগ্‌ল। সেইদিনই শুনলুম, জাহাজখানা যতদিন না মাল-মসলা ও নতুন মাল ওঠানো হয় ঐ বন্দরেই থাক্‌বে। তার পর যাবে চীন ও জাপানে। সেখান থেকে ঘুরতেও পারে; দরকার হলে ভ্লাডিভষ্টক বন্দর অবধিও যাবার সম্ভাবনা। যেখানেই যাক্ আমার আপত্তি নেই। আমি তার আগে এই দেশটা দেখে নি্।

জাহাজ বন্দরে লাগ্‌ল সকালে আমরা বিকেলে ফ্রীম্যান্‌ট্‌লের পথে বেড়াতে বেরুলুম। বেশ সুদৃশ্য শহর।

একগাল হেসে বললে—"আইয়ে দোস্ত"

পথের দুপাশে বড় বড় বাড়ী, কোথাও বাগান। পথ দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া, মটর, লোকজন চলছে। নানা দেশের লোক—চীন, জাপান, রুশিয়া, ফিলিপাইন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ঐ অষ্ট্রেলিয়ারই আসল অধিবাসীরা সাহেব সেজে সিগারেট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে মোটরে, গাড়ীতে বা হেঁটে চলেছে। পথের দুধারে ছোট বড় নানা রকম দোকান—সাজানো, গোছানো, বিজলী আলোয় ঝক্ মক্ করছে। হোটেলগুলোরই বা কি বাহার! দেশটা বেশ গরম। চল্‌তে চল্‌তে তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ল। পথের ধারেই একটা সরবতের দোকানে ঢুকে পড়লুম আইস্‌ক্রীম খাবার জন্যে। সরবতের দোকান বল্‌তে আমাদের পানওয়ালা-মার্কা নোংরা দোকান নয়। সে এমন সাজানো ও পরিষ্কার যে চারদণ্ড বস্‌তে ইচ্ছা করে।

দোকানের ছোট দরজা ঠেলে ঢুকেই দেখি সামনের এক টেবিলে এক কাবুলীওয়ালা! বসে বসে বেশ আরামে আইস্‌ক্রীম টানছে। এখানেও কাবুলীওয়ালা? আমাকে দেখেই তার চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠ্‌লো। আমি মাথার টুপী খুল্‌তেই সে স্থূল একখানা হাত বাড়িয়ে একগাল হেসে বল্‌লে—"আইয়ে দোস্ত"—

কিন্তু সেই দূর দেশে তাকে দেখে ও তার গায়ে পড়ে আলাপে বিরক্তির বদলে মনে আনন্দই হল।

মনে হল ও যেন আমারই দেশের লোক। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সেলাম করে তার টেবিলে গিয়েই বস্‌লুম।

সে বল্‌লে—"এই দূরদেশে তোমাকে দেখে বড় খুসী হলুম।"

বললুম—"আমারও আনন্দ কি কম হয়েছে?"

তারপর আইস্‌ক্রীম খেতে খেতে দুজনের আলাপ চল্‌তে লাগ্‌ল। শুনলুম, সে এসেছে বছর খানেক আগে কারবার করতে। কিন্তু সঙ্গীর অভাবে কারবার ফাঁদতে পারছে না। এদেশের লোকের ওপর তার বিশ্বাস নেই। সেই জন্যে কাউকে সে অংশীদার করতে পারে নি। তবে এবার হয়ত তার কারবার জমবে—

বল্‌লুম—"কি রকম?"

"সঙ্গীর সন্ধান পাওয়া গেছে—"

"কোথায়?"

"আমার সামনে—"

"আমি?"

"হাঁ—"

"ভাল। কিন্তু আমি যে জাহাজে চাকরী করি।—আর টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা আমার ধাতে সইবে না—"

সে আমার কথা শুনে জীভ দিয়ে গরু-তাড়ানো শব্দ করে বল্‌লে—"নেহী দোস্ত। ও দোসরা কারবার। বড় লাভের। এক ঘণ্টায় বাদ্‌সা বনে যাবে। চল, আমার আস্তানায় ব্যাপারটা কি খুলে বল্‌ছি—" বলে উঠে দাঁড়াল।

তারপর বল্‌লে—"বেশীদূর নয়। ঐ যে চৌমাথায় ঘড়িওয়ালা বাড়ীটা! দেখ্‌ছ ওরই ওধারে – চল—দোস্ত—"

তাজ্জব কাণ্ড। ব্যাপারটা ত দিব্যি দাঁড়াচ্ছে দেখছি। বল্‌লুম—"খাঁ সাহেব, কোন বদ কাজ আমার দ্বারা হবে না—"

"হা-হা-হা। তুমি হাসালে দেখ্‌ছি। আগে শোন সব। কাবুলীরা কি কেবল বদ কাজই করে? বহুৎ সাধু কাবুলী আছে—চল। ডর নেই।" শেষটা কি হয় দেখা যাক ভেবে তার সঙ্গে চললুম।

পথে যেতে যেতে সে বল্‌লে—"আমার নাম মীরখাঁ। বাড়ী হীরাট। কাবুল ছাড়িয়ে একেবারে সেই পারস্য-সীমান্তে।"

আমিও আমার পরিচয় দিলুম।

সে বল্‌লে—"আরে তোমাদের গাঁ যে আমি চিনি। আমার এক ভাই এখন ঐ অঞ্চলেই তার কারবার করে—কাল তার চিঠি পেয়েছি—"

"ও! তবে আর কি! আমাদেরও কারবার জমবে ভাল—"

তার পর তার আস্তানায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম বড় ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। মীর খাঁ থাক্‌ত তেতলায়। দুজনে লিফ্‌টে চড়ে তেতলায় উঠে গেলুম। মীরাখাঁর ঘরখানা একেবারে বারান্দার শেষ দিকে। তালা খুলে আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে মীরখাঁ আবার ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিলে। সেখান থেকে বহুদূর অবধি দেখা যেতে লাগল। ফ্রীম্যান্‌টল্‌ বন্দরে তখন আলোগুলো জ্বলে উঠছে। জলে, ডাঙায়, জেটিতে ছোট-বড় নানারকমের আলো বিজলী জ্বল্‌ছে।

মীরখাঁ বল্‌লে—"জাহাজে চাকরী করে যা পাও আমি যা বল্‌ছি তা যদি হয় তাহলে একদম বাদ্‌সা বনে যাবে। কিন্তু খুব সাহস চাই। প্রাণ হাতে করে সে কাজ করতে হবে। কত বিপদ আস্‌বে, সাহায্য করবার কেউ থাকবে না। এমন বিপদ যে আমরা মরেও যেতে পারি, কেউ সে

খবর জানতেও পারবে না।" বলে সে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো।

বললুম—"ব্যাপারটা কি না শুনলে কি করে বুঝব বিপদ আছে কি না? তারপর তুমি যেটাকে বিপদ বলছ, আমার মতে তা নাও হতে পারে—"

"বহুৎ আচ্ছা দোস্ত। এই ত মরদের মত কথা। দেখাচ্ছি তোমায় বলে অষ্ট্রেলিয়ার একখানা ম্যাপ আমার সামনে মেলে তার মাঝখানে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে বললে—"এই যে দেখছ, এসব মরুভূমি। এর ওপর দিয়ে আমাদের দুজনকে যেতে হবে। আবার যদি ফিরি এর ওপব দিয়েই ফিরতে হবে"—

"কি জন্যে যাব?"

"রত্নের সন্ধানে—"

"কি করে বুঝলে যে ওখানে রত্ন আছে?"

মীর খাঁ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বললে—"তুমি রাজী আছ?"

"হাঁ—"

"তবে শপথ কর একথা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।"

আমি শপথ করলুম।

সে বল্লে—"যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তাহলে এর ভীষণ ফল। বুঝলে দোস্ত্?"

বললুম—"তুমিও একথা মনে রেখ খাঁ সাহেব বিশ্বাসঘাতকের বাঁচা কঠিন হবে।"

"আচ্ছা" বলে সে আমার দিকে তার বিশাল হাত-খানা বাড়িয়ে দিলে। বল্লে—"আজ থেকে আমরা দোস্ত। কেউ কারো ক্ষতি করব না; দুজনের জন্যে জান দিয়ে লড়ব—'

"হাঁ। না হলে আমরা মানুষ কিসে?"

তারপর জোব্বার ভেতর পকেট থেকে একটা ছোট পুঁটলী বার করে খুব সন্তর্পণে তার গেরো খুলে সে একখানা পাকানো কাগজ বার করলে। কাগজখানার চেহারা দেখে মনে হ'ল বুঝি মীর খাঁর কোষ্ঠীপত্র। কাগজখানাকে ক্রমে খুলে টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিতেই দেখলাম একখানা নক্সা।

মীর খাঁ তার ওপর ঝুঁকে আঙুল দিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলো। আমিও মনোযোগ দিয়ে নক্সাখানাকে দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ মীর খাঁ বলে উঠ্‌ল—"এই যে এইখানে। এই যে দেখ্‌ছ কালো দাগগুলো এসব পাহাড়—এরই এক

জায়গায় রত্ন পাওয়া যাবে। আর, এই দেখ আমাদের পথ। একটা নয়, ছুটো—যেটা সব চেয়ে নিরাপদ অর্থাৎ বিপদের অন্ত নেই সেটা এই চলে গেছে। আর যেটায় ধরা পড়বার সম্ভাবনা অথচ খুব বেশী বিপদ নেই সেটা ঐ—"

বললুম—"খাঁ সাহেব, তোমার কথা ত বুঝলুম না।—যে পথে বিপদ সেটা আবার নিরাপদ কেমন?"

"হাঁঃ—হাঃ—হাঃ—দোস্ত্—ওর মানে খুব সোজা। সকলকে লুকিয়ে যেতে গেলে—আচ্ছা এখন থাক্। পরে বুঝিয়ে দেব।—কিন্তু আর দেরী করে লাভ নেই। তিন দিনের মধ্যেই আমাদের রওনা হতে হবে। আমি সব ঠিক করে নেব। তুমি আজই কাজে ইস্তাফা দাও—"

"তারা আমাকে ছাড়বে কেন? লেখা-পড়া আছে। পালাতে হবে—"

"বেশ। ঘোড়ায় চড়তে জান?—"

"জানি কিছু—"

"বন্দুক ছুঁড়তে—?"

"না—"

"ছিঃ! আচ্ছা ও আমি শিখিয়ে দেব—ঠিক রইল

পরশু দিন ভোরে আমরা রওনা হ'ব—"বল্‌তে বল্‌তে মীর খাঁ আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি লিফটে উঠলে সে সেলাম করে বল্‌লে—"মনে রেখ—"

"নিশ্চয়।"

পথে চল্‌তে চল্‌তে তার কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করতে লাগলুম। জাহাজে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে কেবিনে শুয়ে সারারাত একরকম জেগে কাটিয়ে দিলুম। মনে যে ভয় বা দুশ্চিন্তা এসেছিল তা নয়। ভাবছিলুম ভাগ্যের কথা। কে বা মীর খাঁ আর কে বা আমি। এই দূর দেশে ওর সঙ্গে এক সরবতের দোকানে দেখা হল। আবার যাচ্ছি এখন ওরই সঙ্গে রত্নের খোঁজে মরুভূমির ভেতর প্রাণ হাতে করে। দুজনের একজন কি দুজনেই হয়ত আর নাও ফিরতে পারি! কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? চেষ্টা উত্তম, সাহস ও ত্যাগ না হলে মানুষ কিছুই করতে পারেনা। পথে কি ঘটবে? যা ঘটুক না কেন, শপথ পালন করবই। তারপর যা হয় হবে।

জাহাজে কারুর কাছে কিছু না বলে পরদিন বিকেলে আমার টাকাকড়ি যাঁ কিছুছিল সে সব ও ঘড়িটা নিয়ে সাধারণ পোষাকে মীরখাঁর বাসার দিকে রওনা হলুম।

সে আমারই অপেক্ষায় ছিল। দেখে মহাখুশী হয়ে বললে—
"তৈরী?"

"নিশ্চয়ই! তুমি?"

"সব ঠিক—কিন্তু এখনই আমাদের রওনা হতে হবে

"কেন?"

"ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় অনেক দূর যেতে পারব। চল আগে কিছু খেয়ে নিই"—বলে সে আমাকে নিয়ে একটা হোটেলের দিকে রওনা হল। হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে বল্‌লে "চল—

"বাড়ী যাবে না?"

"না—"

মীর খাঁ একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করলে।

গাড়ীতে উঠে বল্‌লে—"খুব তাড়া করবার দরকার নেই। অথচ এখনই রওনা হতে হবে তাই মোটার নিলুম না।"

গাড়ীখানা শহর ছাড়িয়ে ক্রমে প্রকাণ্ড একখানা মাঠের মধ্যে পড়ল। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জনহীন পথ—দুপাশে ইলেকট্রিক আলো। সেদিকে কেউ বড় একটা আসে না। মাঠখানা পার হতে আমাদের ঠিক

পনেরো মিনিট লাগল। মাঠখানা ছাড়িয়ে একখানা বাংলোর মত বাড়ীর সামনে আস্‌তেই মীর খাঁ গাড়ী থামাতে বল্‌লে। তার পর গাড়ী থেকে নেমে টাকা বার করে ভাড়া দিতে যেতেই আমিও আমার পার্স টা বার করলুম।

মীর খাঁ আমার হাত চেপে ধরে বল্‌লে—"এখন থাক। আমি দিচ্ছি। পরে হিসেব হবে। আমি কাবুলী, এক পাইও ভুল হবার যো নেই—"

সে ভাড়া চুকিয়ে দিতে গাড়ী খানা ফিরে গেল।

সেই বাড়ীটার চারদিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাইরে কোন আলো ছিল না। বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে তিনটে ঘা দিতেই পাশের একটা জানালা খুলে কে যেন ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"কে?"

"মীর—"

জানালাটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই দরজা খুলে একটা লোক হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এসে বল্‌লে—"খেতে বসেছিলুম আমরা। এস, এস। সঙ্গে কে? দোস্ত্‌ না কি?"

"হুঁ—"

আমরা লোকটার পিছনে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে বল্‌লে—"তোমরা খেয়ে এসেছ?"

"হাঁ—"

"তবে একটু গড়িয়ে নাও। এখান থেকে গোশালা কম দূর ত নয়—দশ ক্রোশ। পথে হয়ত বিশ্রাম করবার সুযোগ হবে না—"

মীর খাঁ বল্‌লে—"তা বটে। কিন্তু আমাদের ঘোড়া, ল্যাসো, বন্দুক, কম্পাস, জলের বোতল, চা, চিনি, খাবার এসব ঠিক আছে ত?"

"আছে বৈ কি খাঁসাহেব—"বলে সে আমাদের দুখানা ইজিচেয়ার দেখিয়ে দিলে। তারপর বল্‌লে—"আমি খেয়ে নি। তোমাদের রওনা হ'তে এখনও তিন ঘণ্টা—"

"তা ত বটেই" বলে মীর খাঁ একখানা চেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করলে। আমিও বাকী চেয়ারখানায় বসতে লোকটা চলে গেল। কিন্তু ঘুম কি আসে? তবুও মীরখাঁর দেখা-দেখি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলুম। পড়ে থাকতে থাক্‌তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতে দেখি পাশে দাঁড়িয়ে মীর খাঁ ও সেই লোকটি—আর দূরে—বহুদূরে কোথায় যেন একটা ঘড়ি বাজছে ঢং—ঢং—ঢং—। রাত তখন বারোটা। মীর খাঁ বল্‌ছে—"ওঠ—ওঠ—এখনই রওনা হতে হবে।"

তাদের সঙ্গে বাইরে এসে দেখি, দুটো বড় বড় তেজী

ঘোড়া বারাণ্ডার কাছে দাঁড়িয়ে। আকাশে মেঘ। বেশ জোরে বাতাস বইছে। হয়ত বৃষ্টিও আসবে।

আমাকে একটা জলের বোতল, ল্যাসো, বন্দুক ও হ্যাভারস্যাক দিয়ে মীর খাঁ একটা ঘোড়া দেখিয়ে বল্‌লে—“ওঠ—”

সে আগে তৈরী হয়েছিল। আমি পিঠে বন্দুক, কোমরে জলের বোতল ও পৈতের মত ল্যাসোটা জড়িয়ে নিয়ে হ্যাভারস্যাকটা একপাশে ঝুলিয়ে ঘোড়ায় উঠ্‌তেই মীরখাঁও বাকী ঘোড়াটায় চড়ে বসল। সেই লোকটা বল্‌লে “সেলাম খাঁ সাহেব—”

“সেলাম—”

“আবার শীগগির তোমাদের দেখব আশা করি—?”

“আশা করি—”বলেই মীর খাঁ ঘোড়া চালিয়ে দিলে।

দুজনে পাশাপাশি চলেছি। ক্রমে শহরতলীর আলো, বাড়ী-ঘর, বাগান-মাঠ সব মিলিয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার। আরও কিছুদূর যেতেই টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি সুরু হল। একটা কথা তখনও আমার মাথায় ঘুরছে। মীর খাঁকে সেই লোকটা বলেছিল—“গোশালা দশ ক্রোশ দূরে।” এর মানে কিঁ? মীর খাঁ আমার কাছে কিছু গোপন করছে নাকি?

জিজ্ঞাসা করলুম—"খাঁ সাহেব, গোশালার কথা কি বল্‌ছিলে তখন?"

"ও! ওকে বলেছি আমরা গরু কিন্‌তে যাচ্ছি। সত্যি কথা বল্‌লে কি আর রক্ষে আছে? কিন্তু আমরা চলেছি কোন্‌ দিকে? দাঁড়াও কম্পাসটা দেখি—"বলে মীর খাঁ টর্চ্চের আলোয় কম্পাসটা দেখে বল্‌লে—"ঠিক চলেছি। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। কিন্তু বৃষ্টিতে বেশীদূর এগোনো সম্ভব হবে বলে ত মনে হচ্ছে না।" তার কথা শেষ হতে না হতে খুব চেপে বৃষ্টি নাম্‌ল। আমরা তখন একটা জঙ্গলের ধারে এসে পড়েছি। তার মধ্যে দিয়েই আমাদের পথ। পথটা ঘুরে পার্থ নগর অবধি চলে গেছে। পথের ধারেই একটা বড় গাছ ছিল। তারই নীচে দুজনে বৃষ্টির জন্য আশ্রয় নিলুম। শীতে পাঁজরাগুলো কাঁপছে। কতক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে হবে কে জানে? হঠাৎ দেখলুম, ভিজে বনের একধার আলোকিত হয়ে উঠ্‌ল। পিচ বাঁধানো ভিজে পথটা চক্‌ চক্‌ করছে। খুব জোর হেড্‌লাইট জ্বেলে মোটর আসছিল। দুজনে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া দুটোকে নিয়ে জঙ্গলের আওতায় সরে দাঁড়ালুম। মোটরখানা বেশ জোরেই আস্‌ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুস্‌ করে সামনে দিয়ে চলে গেল। তারপরই আর একখানা।

এখানা যেন আগের মোটরখানার চেয়ে জোরে আস্‌ছে। মনে হল, ওটার পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু কি ব্যাপার জানবার উপায় নেই।

তারপর সেখান থেকে সেই গাছতলায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর বৃষ্টি ধরে এল। আমরা আবার চল্‌তে লাগলুম। সেই রাত্তেই পার্থ থেকে সিড্‌নী বন্দর অবধি যে রেল লাইন গেছে তা পার হয়ে ভোরের দিকে লোকালয় ছেড়ে বহু দূরে একটা বনের ধারে এসে পৌঁছিলুম। মীর খাঁ বললে "এখন আর নয়। একটা জলা খুঁজে নিয়ে তার ধারে দুপুর অবধি বিশ্রাম করা যাক। তারপর আবার চল্‌ব। কি বল?"

"সেই ভাল—"

দুজনে কিছুক্ষণ ধরে চারিধারে খোঁজাখুঁজি করে একটা গর্ত্ত দেখ্‌লুম। গর্ত্তটা একটা ছোটখাট কূয়ার মত। তার চারধার বেশ পরিষ্কার। মাটিতে ঘোড়ার খুরের ও জুতোর দাগ। দাগগুলো দিন পাঁচছয়ের পুরোণ হবে। মনে হল, একটা লোক এখানে বিশ্রাম করেছিল। আমরা সেইখানেই ঘোড়া দুটোকে নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

চারিদিক থেকে শুক্‌নো ডাল-পালা কুড়িয়ে এনে

আগুন জ্বেলে চা তৈরী করা গেল। সঙ্গে মাংস ছিল। দুজনে পেট ভরে খেয়ে বালির ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। নির্জ্জন বন হাওয়ায় মর্ মর্ করছে। সেই শব্দে ও ক্লান্তিতে চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল।

তারপর ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি মুখে রোদ লাগছে। উঠে ঘড়িতে তখন বেলা দুটো। মীর খাঁ তখনও ঘুমচ্ছে। বোধ হয় রত্ন-খনির স্বপ্ন দেখছিল। মাঝে মাঝে তার মাতৃ-ভাষায় বিড় বিড় করে কি বল্‌ছে আর হাস্‌ছে। আমি মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পার্‌লুম না। বেশ জোর একটা ঠেলা দিতেই সে স্প্রীংয়ের মত তড়াক করে উঠে বসে লাল চোখ দুটো মেলে চারিদিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

বললুম—"ভয় নেই দোস্ত্। বেলা দুটো বেজে গেল।"

"দুটো? চল-চল। এখনই রওনা হতে হবে। ওঃ! বড় দেরী হয়ে গেছে—"

ঘোড়া দুটোকে জল খাইয়ে আমাদের বোতল দুটোতে জল ভরে নিয়ে আমরা রওনা হলুম। বনটা পার হ'তে পুরো একটা ঘণ্টা লাগল। তারপরই তরুলতা ও তৃণশূন্য বিশাল মাঠ। তা থেকে আগুনের হলকা ছুটে আস্‌ছে।

সেদিকে তাকালেই মনে ভয় জাগে। মীর খাঁ সেখানে দাঁড়িয়ে জোব্বার ভেতর থেকে ম্যাপখানা বার করে খুব মনোযোগ দিয়ে একবার দেখে নিলে। আবার সেখানা যন্ত্রের সঙ্গে জামার ভেতর রাখতে রাখতে বল্লে—"বরাবর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আমাদের যেতে হবে—আমরা ঠিকই এসেছি—চল—"

এবার আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম। মাঠখানা পাড়ি দিয়ে প্রায় শেষ বেলার দিকে বালুর রাজ্যে পৌঁছলুম। তার যেদিকে তাকাই কেবল তপ্ত বালু। হাওয়ায় বালু তপ্ত উড়ছে; তার সোঁ সোঁ শব্দটা কানে বিশ্রী ঠেকতে লাগ্‌ল। এই সীমাহীন শুষ্ক সমুদ্র, আমাদের পার হতে হবে! শেষ অবধি ঘোড়া ছুঠো চল্‌তে পারবে ত? দৃশ্যটাই কি ভয়ঙ্কর!

আমরা আস্তে আস্তে বালুর ওপর দিয়ে চল্‌তে লাগলুম। হঠাৎ মনে হল, সামনে বহুদূরে একটি মাত্র জায়গা থেকে বালু উড়্‌ছে। তার একটু পরেই ডান দিকেও বালু উড়তে দেখা গেল। ও কি বাঁ দিকেও যে বালু উড়্‌ছে! হাওয়ায় এমনি ভাবে ত বালু ওড়ে না। আর এর রঙও যে কালো। জিজ্ঞাসা করলুম "কি ব্যাপার খাঁ সাহেব? মরু-ঝড় নাকি? কিন্তু মরুভূমির মধ্যে ত এ ভাবে ঝড় ওঠে না। সে ঝড় ত চারিদিক অন্ধকার করে,

সূর্য্য ঢেকে, মাঠের ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে ছুটে আসে। এদেশে কি—? ঐ যে দেখ-দেখ—”

মীর খাঁ বল্‌লে-“ও বালু নয় ধোঁয়া। জঙ্গলীরা দলের সকলকে চারিদিকে খবর পাঠাচ্ছে। ওই হল ওদের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ। আমরা যে এসেছি সে কথা ওরা জান্‌তে পেরেছে। তাই সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে। বালুর টিপির ওপর ওরা আগুন জ্বালে; তার ধোঁয়া বহুদূর থেকে দেখা যায়। কিন্তু এখন থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। পদে পদে বিপদ সুরু হল।”

আমরা তেমনি চলেছি। সেই ধোঁয়ার নিশান ক্রমে শুষ্ক আকাশে মিলিয়ে গেল। কোথাও যে কোন প্রাণী আছে তার চিহ্নও আর নেই। এমন কি, আকাশে একটী পাখীও দেখা যাচ্ছে না। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখ্‌লে গলা ত দূরের কথা বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে। ক্রমে বেলা পড়ে এল। পশ্চিমে মরুভূমি পারে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! চোখে না দেখ্‌লে বোঝা যাবে না। সূর্য্যাস্তের পরও বহুক্ষণ বহুদূর অবধি পরিষ্কার দেখা যেতে লাগ্‌ল।

আরও মাইল তিনেক গেলেই একটা কুয়ো পাওয়া যাবে। এদিকে রাত হয়ে আস্‌ছে—অন্ধকার রাত। তারার

আলোয় যেটুকু সম্ভব পথ চিনে চল্‌তে হবে। আবার যদি জঙ্গলীর দল ওখানে থাকে—থাকাই ত সম্ভব—তাহলে সব মাটি। এমনই ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। এর ওপর ওদের উৎপাৎ। তবে গরম ক্রমে কম লাগ্‌ছে। এবার কিছু জোরে যাওয়া যেতে পারে।

যথাসম্ভব জোরেই আমরা চল্‌তে লাগলুম। রাতও যেন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। মাইল দুই যেতেই চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে গেল। মীর খাঁ বল্‌লে—"দোস্ত্‌, ঐ দেখ আলো। মনে হচ্ছে আলোটা কূয়োর ধারেই। ওখানে আর না। চল অন্যদিকে যাওয়া যাক্‌।"

আমরা সেখান থেকে উত্তর দিকে চল্‌তে লাগলুম। আরও মাইল দুই চলে একটা বালুর ঢিপির পাশে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লুম। ঠিক করলুম, সেখানেই রাত কাটাব। মরুভূমিতে দিনে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা। একটু আগুন জ্বাল্‌তে পারলে সুবিধা হ'ত।
অভাব ও জঙ্গলীদের ভয়ে তা সম্ভব হল না। অন্ধকারেই দুজনে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লুম। স্থির হল দুজনে একসঙ্গে ঘুমোব না। আমি প্রথম দিকে জেগে পাহারায় থাক্‌ব।

নিস্তব্ধ মরুভূমি। ঘোড়া দুটো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মীর খাঁ নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে সুরু করলে। আমি সেই কূয়োর ধারে আলোটার দিকে তাকিয়ে বসে আছি। মনে হচ্ছে আলোটা যেন ক্রমে বড় হচ্ছে। হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল। তারপরই সব চুপ্‌চাপ্‌। কিছুক্ষণ কেটে গেল। আলোটাও নিভে গেছে। কিছুদূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। মনে কেমন সন্দেহ হ'ল। এখানে পেঁচা? ঐ যে দূরে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে—একটা নয়, অনেক গুলো শেয়াল। আবার পেঁচার ডাক। এবার কিছু কাছে। মীর খাঁরও ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে বসেই বললে—"হুসিয়ার! শুন্‌তে পাচ্ছ? জঙ্গলীরা আস্‌ছে—"বল্‌তে বল্‌তেই তার মাথার ওপর দিয়ে সোঁ করে কি যেন চলে গিয়ে কিছু-দূরে ধপ করে মাটিতে পড়ল।

"বর্শা! ঘোড়া দুটোকে সামলাও—ওঠ—"দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া দুটোকে মাটিতে শুইয়ে দিলুম। তৈরী ঘোড়া! তারাও যেন বিপদ বুঝ্‌তে পেরেছিল। আমরা তাদের পেটের ওপর হয়ে শুয়ে বন্দুক পেতে থাকলুম। মীর খাঁ বল্‌লে—" ট্রিগার তুলে বন্দুকের গোড়াটা তোমার কাঁধের সঙ্গে লাগিয়ে রাখ। যখন বলব

তাদের পেটের ওপর উপুড় হয়ে বন্দুক পেতে রাখুন।

ট্রিগার তুলে টিপবে। নিশানার কোন দরকার নেই—”

সেই বিপদেও আমার মনে আনন্দ দেখা দিল। হয়ত ওদের বর্শা, তীর বা বুমারাংয়ের আঘাতে মারাও যেতে পারি। কিন্তু আমার গুলিতে কি ওদের কেউ মরবে না? আমরা মাত্র দুজন; আর, ওরা হয়ত সংখ্যায় পঁচিশ ত্রিশ জন কি তার বেশী হবে। যদি আমাদেরই জয় হয়, তাহলে আর আনন্দের সীমা থাকবে না। মনের কথাটা একটু জোরে উচ্চারণ করলুম।

মীর খাঁ বল্‌লে—“তাহলে বিপদের সীমা থাকবে না। ওরা এর শোধ—চালাও শীগগির গুলি। ঐ যে কালো চেহারা ভূতগুলো। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে তীর চল্‌ছে, বর্শা ছুট্‌ছে—শীগগির—”

আমরা দুজনেই গুলি চালালুম। একবার—দুবার—তিন বার—। মনে হচ্ছে ওরা পালাচ্ছে কিছুদূরে। অসম্ভব কাত্‌রাণী শোনা গেল। তারপরই সব চুপ। কিছুক্ষণ আগে এত বড় একটা ব্যাপার যে হয়ে গেল তার কোন লক্ষণ নেই। [illegible] এতই সব নিস্তব্ধ।

সে রাত্তে আমরা কেউ ঘুমোলুম না। শত্রুদের প্রতীক্ষায় দুজনে বন্দুক হাতে দুমুখো বসে রইলুম। কিন্তু,

কেবল শূন্য কোটর দুটো মরুভূমির দিকে হাঁ করে আছে

সারা রাতের মধ্য কারো সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ তারা অনেক দূরে সরে গিয়ে থাক্‌বে। তারপর পূব দিক ফর্সা হতেই আমরা সেই কূয়োর দিকে রওনা হলুম।

একটু গিয়েই বালির ওপর জঙ্গলীদের পায়ের ও রক্তের দাগ দেখা গেল। দাগগুলো কূয়োর দিক থেকে এসে বরাবর উত্তর দিকে চলে গেছে! দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবতঃ জংলীরা সেইদিকেই গিয়ে থাক্‌বে। আমরা আর সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে সেই কূয়াটার দিকে সোজা চল্‌তে লাগলুম।

খানিকটা জায়গা জুড়ে ছোটখাট একটা জঙ্গল ও স্পিনিফেক্‌স্‌ ঘাসের বন, গোটা দুই বড় বড় বাবলাজাতীয় গাছ। তার মাঝে একটা কূয়ো। ঐ কূয়োটি ছাড়া সে অঞ্চলে আর কোথাও জল নেই। কূয়োথেকে জল তুলে ঘোড়া দুটোকে খাইয়ে আমরাও হাত-মুখ-মাথা ধুয়ে কিছু খেয়ে আবার চল্‌তে লাগলুম।

তখনও বেশ ঠাণ্ডা ছিল। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়তে লাগল। দুপুরের দিকে আর চলা যায় না। মাথায় ওপর প্রচণ্ড সূর্য্য। তপ্ত হাওয়ায় বালি উড়ছে। কাছে কিনারে কোথাও একটু আশ্রয় চোখে পড়ছে না।

ঘোড়া তুটোও বড় ক্লান্ত। চল্‌তে চল্‌তে চোখে পড়ল দূরে কয়েকটা বাব্‌লা গাছ। গাছগুলোতে পাতা নেই, কেবল সরু সরু আঙ্গুলের মত ডালগুলো বেরিয়ে আছে। গাছ যত শীর্ণ ই হোক না একটু ছায়া দেবেই। ছায়াহীন পথে তাই মস্ত আশ্রয়। আমরা সেইদিকে যেতে লাগলুম। মীর খাঁ ছিল আমার আগে। সে গাছগুলোর কাছে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "আল্লা আরে এ কি ?—"

তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখি, একটা লোক মরে পড়ে আছে ; তার কাছ থেকে কিছুদূরে একটা মরা ঘোড়া। তুটো দেহই শুকিয়ে কাঠ। হয়ত দিন পনেরো আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। মীর খাঁ বল্‌লে—"উপায় নেই। আমাদের এইখানে এই মড়ার পাশেই একটু বিশ্রাম করতে হবে"—বলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

আমিও একটু দূরে গিয়ে একটা গাছতলায় নেমে পড়লুম। লোকটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হলনা। তার মুখের চেহারা কি ভয়ানক! চোখ তুটো নেই। কেবল শূন্য কোটর তুটো মরুভূমির দিকে হাঁ করে আছে। লোকটা বোধহয় ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে এইখানে মারা গিয়েছিল।

মীর খাঁ বললে—"লোকটা কে জান্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখা যাক, ওর পকেটে কোন জিনিস পাওয়া যায় কিনা।"

কিন্তু তার পকেট খুঁজতে হল না। পাশেই একখানা নোট বুক পড়েছিল। মীর খাঁ সেখানা তুলে নিলে।

তার ওপরের মলাটখানা নেই। ভেতরের খানকয়েক পাতা কোথায় উড়ে গেছে; কয়েকখানা পাতা আবার ছেঁড়া। লেখাও সব জায়গায় স্পষ্ট নয়। তবুও কষ্টেসৃষ্টে যেটুকু পড়া গেল সেটুকু এইটুকু মাত্র জানা গেল লোকটা মাস দুই আগে বেরিয়েছিল রত্নের সন্ধানে। কিন্তু কোথায় সে রত্ন-পাহাড় তা সে মরুভূমির নানা জায়গায় খোঁজ করেও পায় নি। অবশেষে ক্লান্ত দেহে ও বিফল মনে দেশে ফিরে যাচ্ছে। আহা বেচারা!

নোটবুকে শেষের দিনের যে তারিখ দিয়েছিল, তা হিসেব করলে পনেরো দিন আগের হয়। তাই হবে। পনেরো দিন আগেই লোকটা এই গাছতলায় মরে গেছে। আমরা আর সেদিকে তাকালুম না। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আবার ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগলুম। জংলীরা যে পাহাড়টার দিকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই পাহাড়টা বিকেলে পার হয়ে গেলুম।

ওখানকার পাহাড় কেউ দেখেন নি? এখানকার মত নয়। বনজঙ্গলও তাতে খুব বেশী নেই। একে ত জলের অভাব। তার ওপর উইয়ের জ্বালায় কি গাছ-পালা

তেমন সতেজে ডাল-পালা ছেড়ে, পাতা ছড়িয়ে বাড়তে পারে ? সেদিন আর কিছু ঘটল্ না। সেদিকে কোথায় জল পাওয়া যায় ম্যাপ দেখে ঠিক করে সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা সেখানে পৌঁছে আস্তানা গাড়লুম।

পরদিন আবার চলেছি। চারিদিকে বালির ঢিপি। এক একটা জায়গায় বালুরাশি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঁচু হয়ে আছে। হাওয়ায় এরকম হয়। ঐ রকম একটা স্থির বালুর ঢেউয়ের ওপরে উঠ্তেই দেখি সামনে প্রকাণ্ড এক হ্রদ। কাচের মত পরিষ্কার তার জল। রৌদ্রে ঝিকমিক করছে। তার তীরে অনেক গাছ-গাছড়া। কিন্তু সবগুলো মরা ও শুকনো। একটা পাখীও সেখানে নেই। এতে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। এমন জায়গায় কোথায় সতেজে গাছ গজাবে, পাখী উড়বে তা নয় একি ? আবার ওটা কি ? উট্পাখী নাকি ? দিব্যি জলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে ত।

মীর খাঁ বল্লে "ওর নাম এমু্ পাখী—ওর মত আর এক রকম পাখী এদেশে আছে। তার নাম কেসোয়ারী। সেগুলো বড় চমৎকার দেখ্তে। কিন্তু এরা উড়তে পারে না। ঐ দেখ পাখীটা উটপাখির মত দৌড়ে পালাচ্ছে। ডানা না থাকলে উড়বে কি করে ? এই

মরুভূমির মধ্যে ও পাখী অনেক দেখ্‌তে পাবে। ওদের বাসা নেই ডিমপাড়ে বালির ওপর গর্ত্ত খুঁড়ে।"

"পাখীগুলো কি সাঁতারও দিতে পারে? ঐ যে হ্রদের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য! ডুব্‌ছে না ত? ওকি! ওটা জল না? তবে কি মরীচিকা?"

সেটা জলও নয় মরীচিকাও নয় লবণ হ্রদ। কত-পথিক, ঘোড়া, উট্, গরু যে ওর ওপর দিয়ে চলবার সময় একদম তলিয়ে যায় তার চিহ্নও থাকে না। মীর খাঁ বল্‌লে-"কিন্তু ঐ হ্রদের ওপর দিয়েই আমাদের যেতে হবে।"

"আমরাও ত ডুবে যেতে পারি?"

"না। এমুটা যেখান দিয়ে হ্রদটা পার হয়ে গেল, সেখান দিয়ে গেলে কোন ভয় নেই। ওরা জান্‌তে পারে কোথায় বিপদ—" বলে মীর খাঁ আমার আগে আগে চল্‌তে লাগল।

এমুটাকে আর দেখ্‌তে পেলুম না। কিন্তু তার পথ ধরে আমরা নির্ব্বিঘ্নে হ্রদটা পার হয়ে গেলুম।

বিকেলের দিকে আবার একটা আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানে যায় কার সাধ্য। প্রায় পাঁচ শ' গরু সেখানে জমা হয়ে জায়গাটাকে গোহাটা

করে তুলেছে। দূর থেকে তাদের ডাকাডাকি ও গলার ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল—চমৎকার। মরুভূমির মধ্যে সে দৃশ্য যে না দেখেছে, সে শব্দ যে না শুনেছে সে সত্যিই দুর্ভাগ্য। কিন্তু কি করা যাবে? অগত্যা আমরা আরও কিছুদূর গিয়ে গোটা দুই বড় বালির ঢিপির মাঝে রাতের মত আশ্রয় নিলুম। সঙ্গে কিছু জল ছিল। ঘোড়াগুলোকে একটু জল খাওয়ালে ভাল হ'ত। কিন্তু ওখানে গেলে লোক জানাজানি হবে। তার ওপর আমি জাহাজ থেকে পলাতক। হয়ত আমাকে ধরবার জন্যে চারিদিকে খবরও গেছে। কাজেই দূরে থাকা নিরাপদ।

রাতে খুব আরামে ঘুম হ'ল। সকালে উঠে দেখি দক্ষিণ দিকে থেকে ধূলো উড়িয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে, হাঁকা-হাঁকি করতে করতে আরও গরুর পাল আসছে। ভাবলুম, ঐটেই বোধহয় সেই গোশালা। মীর খাঁ বল্লে—"সেটা এখান থেকে দক্ষিণদিকে দুদিনের পথে। ঐ গরুগুলো যাচ্ছে নতুন কোন জায়গায়—"

কিন্তু এই গাছ-পালাও ঘাস শূন্য মরুভূমির মধ্যে গরুগুলো থাকে কোথায় আর খায় বা কি? এই ত চলেছি বালির সমুদ্র দিয়ে—ওপরে শুক্‌নো নীলাকাশ। বেলা তখন প্রায় বারোটা। ঘোড়াদুটো জলের জন্যে

একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথায় জল? চারিদিকে তাকাতে তাকাতে দেখি, একটা জায়গা খালের মত। তার মধ্য দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। খালটা হাত কয়েক গভীর হবে। সেই স্রোতে একটা মরা ষাঁড়, ছোট ছোট গাছ-পালা, একটা কুকুর ও আরও কি সব ভেসে আস্‌ছে। কিন্তু খালটার তীরে দু একটা বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু নেই, একটা ঘাসও না। আশ্চর্য্য ব্যাপার নৈকি?

যেখানে জল সেইখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকার কথা। কিন্তু এটা আজব দেশ। হয়ত বৃষ্টি হয়েছে পঞ্চাশ মাইল দূরে, সেই জল এই বালুসমুদ্রে খাল বয়ে ছুটে এসেছে! সঙ্গে বয়ে এনেছে ঐ সব আবর্জ্জনা। কিছুদিনের মধ্যেই এই খালের তীরে তীরে ঘাস গজাবে; জায়গাটা হয়ে উঠ্‌বে সুন্দর। এই ঘাস জলই হবে গরু ঘোড়ার খাদ্য। কিছুদিন পরে এই খালও আবার শুকিয়ে যাবে।

ঘোড়া দুটোকে জল খাইয়ে খালটা পার হয়ে আমরা চল্‌তে লাগ্‌লুম।

বহুদূর চলে গিয়ে দেখ্‌লুম, সম্মুখে একসার ছোট ছোট পাহাড় উঠেছে। মীর খাঁ ম্যাপখানা বার করে

তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে নিতে বল্‌লে—"ওর পঞ্চাশ মাইল পরে এক সার পাহাড়, তার ষাট মাইল পরে আবার পাহাড়ে দেশ। তারও ঠিক সাতাত্তর মাইল পরে যে পাহাড় সেইখানে"—মীর খাঁর চোখ দুটো আনন্দে চক্‌ চক্‌ করে উঠ্‌ল।

অর্থাৎ আমাদের গন্তব্য জায়গায় পৌঁছতে তখনও প্রায় দুশো মাইল পথ বাকী! ঘোড়া দুটোর অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে। শেষ অবধি হয়ত সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই পারবে না। পথটা হয়ত এর চেয়েও খারাপ হবে। এখনও তেমন বিপদে পড়ি নি। এরপর ভাগ্যে কি আছে কে জানে! যাই থাক যাবই। পায়ে হেঁটে এই দারুণ মরুভূমি পার হব। আমাদের কত আগে লোকে এই দেশের কোথায় কি আছে জানবার জন্যে বার হয়েছিল। তাদের পরে আরও অনেকে গেছে। কেউ ভয় পায় নি। তবে আমরা কেন ভীরু ও শক্তিহীনের মত পিছিয়ে পড়ব? তাদের মত আমরাও ত মানুষ।

ওঃ সেদিন কি বাতাস! তপ্ত বালুকণা উড়ে এসে চট্‌চট করে মুখে-চোখে লাগ্‌ছে। আর না এগিয়ে আমরা সেখানে শুয়ে পড়লুম। তবুও কি নিস্তার আছে? দেখতে দেখতে হাওয়ায় চোখের সামনে গোটা কয়েক বালির ঢিপি

উড়ে গিয়ে জায়গাটা সমান হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, আমাদেরও হয়ত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যথাসম্ভব মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলুম। কিন্তু কিছুক্ষণের পরই হাওয়ার বেগ কমে আসতে আমরাও উঠে আবার চল্‌তে লাগলুম।

দূরে সেই পাহাড়ের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাবে ভেবে কতকটা আশ্বস্ত হলুম। কিন্তু ওকি! পাহাড়টার এদিকে-ওদিকে যে ধোঁয়া উড়ছে। তবেই ত সর্ব্বনাশ! বুঝতে বাকী রইল না ওটা জংলীদের আড্ডা? কোন রকমে কি ওখানে রাতখানা কাটানো যাবে না?

মীর খাঁ বল্‌লে "কি বল তুমি?"

"চেষ্টা করেই দেখা যাক না—"

"তার চেয়ে বরং একটু ডানদিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক্‌। ক্রোশ দুই, কি, আড়াই দূরে একটা কূয়ো থাকবার কথা—"

"বেশ—"বলে ডান দিকে তাকিয়ে দেখি সেদিকেও ধোঁয়া উড়ছে যেন একটা কালো দৈত্য।

"এখন কি উপায় খাঁ সাহেব? এ ত দেখ্‌ছি শত্রু-পুরী আমাদের চারিদিকে শত্রু—"

"তাইত—" বলে খাঁসাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। "কিন্তু ওরা শত্রু নাও হতে পারে। চল এগিয়েই

যাওয়া যাক্—"বলে খাঁসাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে।

খাঁসাহেবের হাসির অর্থ বুঝ্‌তে আমার দেরী হ'ল না। বললুম—"তুমি বুড়োমানুষ, আমার পেছনে পেছনে এস। যদি কিছু হয়, সব আগে আমি আছি।" বলে আমি ঘোড়াটাকে একটু জোরে চালিয়ে খাঁ সাহেবকে ছাড়িয়ে গেলুম। মীর খাঁ আমার পিছনে পিছনে আস্‌তে লাগ্‌ল। পাহাড়ের কাছাকাছি পোঁছে দেখি একদল জংলী সার বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে আস্‌ছে। প্রত্যেকের হাতেই তীর-ধনুক, বর্শা, বুমারাং প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র। তারা কোন দিকে যাবে ঠিক বুঝতে পারা গেল না। আমরা তেমনই এগিয়ে চলেছি। যখন পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁছলুম তারাও ততক্ষণে নেমে এসেছে। কি চমৎকার তাদের স্বাস্থ্য। গায়ের রং তেমন কালো নয়। চওড়া বুক! মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পরণে কিছু নেই। কিন্তু বুকে-পিঠে উল্কী—দেখ্‌লে গা শিউরে ওঠে। তারা সোজা আমাদের সামনে এসে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আমাদের যুদ্ধের কোন লক্ষণ না দেখ তারা আমাদের ঘিরে বর্শা উঁচিয়ে, চীৎকার করে তাণ্ডব নাচ সুরু করে দিল। এক একবার এমন ভাব দেখায় যেন আমাদের বুকে বর্শা বিঁধিয়ে

দেবে। তবুও আমরা তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ এমনি করে পর, নাচ থামিয়ে একজন এগিয়ে এল।

আমি ইসারায় দেখালুম জল চাই, ক্ষিদেও পেয়েছে। লোকটা ফিরে গিয়ে দলের সেই বোধহয় সর্দ্দার, তাকে কি বল্‌লে। সে ইসারায় আমাদের অনুসরণ করতে বলে সদলে পাহাড়ের নীচে একটা জঙ্গলা জায়গার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেখানে গিয়ে সকলে এক জায়গায় বস্‌লুম। কিছুক্ষণ পরে খাবার এল—গোটাকয়েক গিরগিটি পোড়া, সাপ, পাখী ও কতকগুলো গাছের শিকড়। একটা লোক এক কলসী জল নিয়ে এল। তাতে যেন কিসের পাতা ভাস্‌ছে। খাবার ও পানীয় দেখে আমাদের ত চক্ষুস্থির। কি করা যায়? আমি প্রথমে একটু জল খেলুম। খুব ঠাণ্ডা। জলখাবার পরেই গায়ে বেশ জোর এল। একটা শিকড় তুলে চিবিয়ে দেখি মিষ্টি যেন আক্‌। খাঁ সাহেবও আমার দেখাদেখি খেতে সুরু করে দিল। কিন্তু তার ঝোঁক পোড়া পাখী দুটোর দিকে। ইসারায় বললুম "সাহেব, দুটোই তুমি খাও। আমার পেট ভার—"

খাঁ সাহেব ত মহা খুশী। পাখী দুটো তখনই শেষ করে ফেল্‌লে। ঘোড়া দুটোও ঘাস জল খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে

উঠ্‌ল। শুক্ল পক্ষ সবে সুরু হয়েছে। কিন্তু তখন রওনা হলে কত দূরই বা যাওয়া যাবে? আরও দু তিন দিন যাক্! এবার থেকে রাতেও কিছু কিছু চল্‌তে হবে। নাহলে আমরা কবে পৌঁছব ঠিক কি? কাজেই সে রাতখানা সেখানে বিশ্রাম করে পরদিন ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

সেদিনটা আজও আমার বেশ মনে আছে। রোদের তেজ তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে কোথায় একটু ছায়া নেই যার তলায় বসে দু-দণ্ড বিশ্রাম করব! আর ত চলা যায় না। খাঁ সাহেবও কাতর হয়ে পড়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, দূরে এক প্রকাণ্ড জলাশয়। তার তীরে গাছপালা, ছোট একটা পাহাড় ও পাখী উড়ছে। আমরা সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগলুম। কিন্তু সেটাও সরে সরে যাচ্ছে। ঘোড়া দুটোও আর চল্‌তে পারে না। তাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। পা নুয়ে পড়ছে। সঙ্গে যে জল ছিল তাও প্রায় শেষ হয়ে এল। তবুও সেই জলাশয়ের দেখা নেই। বরাবরই তা দূরে সরে যাচ্ছে। তার পিছনে ছুটে আমরা পথ ছেড়ে বিপথে অনেক দূরে গিয়েও পড়েছি। মনে হতে লাগ্‌ল, এইখানেই আমাদের সকলকে প্রাণ হারাতে হবে। এমনি করে বহুক্ষণ চলে শেষে সত্যই এক কূয়োর সন্ধান পেয়ে সেখানে গিয়ে লুটিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ

বিশ্রামের পর গায়ে একটু জোর এল। উঠে কূয়োতে জল তুলতে গিয়ে দেখি শুকনো। হায় কপাল! এখন কি হবে? কোথায় একটু জল পাব? জায়গাটার চারিদিকে প্রচুর ঘাস ছিল। একটু এদিক-ওদিক করতে করতে দেখি ঘাসগুলোর মাঝে ছোট একটা গর্ত। তার পাড়ের মাটি ভিজে। নিশ্চয়ই এই গর্ত্তটায় জল আছে। জলের থলেটা তার মধ্যে নামিয়ে দিতে ছপাৎ করে শব্দ হল।

সেদিন সেখানে কাটিয়ে পরদিন বিকেলের দিকে আবার চলতে লাগলুম। রাতের বেলাও যতক্ষণ চাঁদের আলো পাওয়া গেল আমাদের চলার বিরাম ছিল না। তারপর অন্ধকারেও কিছুদূর চলে রাতখানা খোলা মরুভূমিতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দিলুম। রাতের বেলা শুনলুম কোথায় যেন এমু পাখী ডাকছে ঠিক যেন ঘড়ি-ঘণ্টা বাজছে। একটা দুশ্চিন্তা আমাদের মাথায় এসেছিল। সঙ্গে খাবার—ছোলা, কনডেনস্‌টমিল্ক, পাঁউরুটি, বিস্কুট ও কয়েক রকমের শুকনো ফল—আর অল্পই আছে। এগুলো ফুরিয়ে গেল কি করব? শুনেছি, এমুর মাংস মন্দ নয়। এমুছানার মাংসও চমৎকার। কিন্তু এগুলো শিকার করা কঠিন। তবুও প্রাণের দায়ে তাও করতে হবে।

কিন্তু পরদিন কোথাও কোন এমু বা ক্যাসোয়ারী চোখে পড়ল না। চারিদিকে সীমাহীন নিস্তব্ধ মরুভূমি; আকাশও তেমনই মেঘশূন্য। অনেক ওপর দিয়ে চারখানা এরোপ্লেন উড়ে গেল। আবার ফিরে এল। বার কয়েক ঘূরপাক দিয়ে যেদিন থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে গেল। রকম দেখে মনে হল, কি যেন খুঁজতে বেরিয়েছে। আমাদের কি?

মীর খাঁ বল্‌লে— "আমরা কি দোষ করেছি যে আমাদের পিছনে ওরা তেল পুড়িয়ে ধাওয়া করবে? খুব সম্ভব মরুভূমির ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।" বলে হো হো করে হাস্‌তে লাগল।

প্রায় চার দিন লাগল আমাদের সেই পঞ্চাশ মাইল পার হতে। সামনেই ম্যাপে আঁকা সেই পাহাড়। কিন্তু আমাদের পথটা তার মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে গেছে। এবার বেশ নিরাপদেই জায়গাটা পার হয়ে গেলুম। তবে এক নতুন বিপদ দেখা দিল। ঘোড়াগুলোর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এসেছে। বাকী সত্তর মাইল চল্‌তে পারবে বলে আমাদের ভরসা হ'ল না। ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। চলবারও তেমন উৎসাহ নেই। শুয়ে পড়তে পারলেই যেন তারা খুশী হয়। তবুও যতদূর পারা

যায় তাদের পিঠেই যাওয়া যাক। তারপর যাহয় হবে।

এদিকে জায়গাটার যত কাছে যাচ্ছি আমাদের মনও চঞ্চল হয়ে উঠছে। যদি আর কেউ সেখানকার সন্ধান পেয়ে থাকে? কিংবা যদি আমাদের ধারণা মিথ্যে হয়? এই সময় ঘোড়া দুটো খোঁড়া হয়ে আস্‌ছে? তবুও নানা রকমে তাদের উত্তেজিত করে আমরা চল্‌তে লাগলুম। শুক্লপক্ষের রাত। কোন কোন দিন পায়ে হেঁটেও রাতের বেলা চলি। এমনি করে প্রায় অর্দ্ধেক পথ পার হয়ে এলুম। ঘোড়া দুটোও আর চল্‌তে পারে না। মীর খাঁর ঘোড়াটা একদিন পথের মাঝখানে বালুর ওপর চারপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আর উঠ্‌ল না। বাকী আমারটা। কিন্তু তারও যে অবস্থা হয়ত মাইল কয়েক যেতে যেতেই টলে পড়বে। এখন ওর বোঝা আমি নয়, ওই আমার বোঝা হয়ে উঠেছে।

বল্‌লুম "খাঁ সাহেব মায়া বাড়িয়ে দরকার কি? এইখানেই ঘোড়াটার সব যন্ত্রণার শেষ করে দেওয়া যাক্—" বলে ইশারায় বন্দুকটা দেখালুম।

মীর খাঁ তৎক্ষণাৎ নিজের বন্দুকটা হাতে নিয়ে এক গুলিতে ঘোড়াটাকে শেষ করে বল্‌লে—"চল

এমু

এমুর ডিম।

দোস্ত্। এখন আমরা দুজন। কে থাক্‌বে, কে যাবে জানিনা—”

মাইল কয়েক পার হয়ে সামনে আবার বড় বড় সারবন্দী বালুর ঢিপি দেখা গেল যেন ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়ই বটে। তার বালু স্তরে স্তরে জমে পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে। কোন দিন সেগুলো ক্ষয় হবেনা; বৃষ্টিতেও না, বাতাসেও না। হয়ত তার ওপর আরও ক্রমে বালু জমে জমে আকাশ প্রমাণ হয়ে উঠবে। পাহাড় সারি লম্বায়ও মাইল খানেক হবে। আমরা সেগুলো পার হয়েই সাম্‌নে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

মাইলের পর মাইল বড় বড় গাছ—কিন্তু তার একটাতেও পাতা নেই; ডালগুলো সব ভেঙ্গে পড়েছে। কেবল দাঁড়িয়ে আছে মোটা মোটা ছালশূন্য গুঁড়ি—সাদা যেন হাড়। সেই মরা বনের ভেতর দিয়ে এমন একটা সুর তুলে শুষ্ক তপ্ত বাতাস বয়ে আস্‌ছে যে আমাদের মনে হতে লাগল—বহুলোক যেন একসঙ্গে চাপা সুরে বুক ভাঙা দুঃখে কাঁদছে। এ বনের যেন কোথাও শেষ নেই। আমাদের দুজনেরই মনে তখন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

খাঁ সাহেব আস্তে আস্তে জোব্বার ভেতর থেকে ম্যাপখানা বার করলে। তারপর বালুর ওপর বিছিয়ে

দেখ্তে দেখ্তে বল্লে—"এর মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে—"বলে উঠে দাঁড়িয়ে সেই বনের ওপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে থাক্তে থাক্তে হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্ল— "দোস্ত্, ঐ দেখ আকাশের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে আছে পাহাড়—ঐ—ঐ। আমরা এসে পড়েছি—চল— চল—"

মীর আমাকে টান্তে টান্তে সেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমরা চলেছি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে চল্তে এমন হয় নি। বার বার মন দমে যেতে লাগল— এইখানেই কি যমের বাড়ী? সব মরা? একটা ছোট পোকাও ত চোখে পড়ছে না। কেন এমন হয়ে আছে? কিসে এত বড় একটা বন শুকিয়ে গেল? কিন্তু কিছুতেই ঠিক কারণটা জানতে পারলুম না। মীরখাঁর মনে কি হচ্ছিল জানিনা, সে এক রকম ছুটে চলেছে।

সেই বনটা পার হতে আমাদের লাগল প্রায় দুদিন। ক্রমেই পাহাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলুম—সেই বনটার একদিকে কালো ধোঁয়া! ওখানেও জংলীদের বাস? যেখানেই থাক তারা আমরা ত চলি।

সেইদিনই বিকেলের দিকে আমরা পাহাড়গুলোর

আমরা পাহাড়গুলোর তলায় পৌঁছলুম

জলায় পৌছলুম। মীরখাঁ বল্‌লে—"এইবার আমাদের ভাগ্যের শেষ পরীক্ষার দিন—"

তার কথাই সত্য হয়েছিল। তিনদিন ক্রমাগত সেই পাহাড়গুলোর মাঝে, ওপরে, নীচে খুঁজে আমরা চন্দ্রকান্ত মণির সন্ধান পেয়েছিলুম। যা পেরেছিলুম সঙ্গে নিয়েছি। এই দেখুন, দু একটা দেখাই এই বলে সামন্ত একটা থলের ভিতর থেকে কয়েকটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। ইলেকট্রিকের আলোয় সেগুলোর ওপর দিয়ে নানারকম রঙ খেলে গেল।

তারপর থলেটা পকেটে রাখতে রাখতে বল্‌লেন "আমরা ফিরি কি করে আপনাদের হয়ত জান্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। সেও এক মজার ব্যাপার। দিন কয়েক পরে ওখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে বরাবর উত্তর দিকে চল্‌তে থাকি। দুজনেরই চেহারা রোদেপুড়ে, পথশ্রমে, অনাহারে, উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে কদাকার হয়ে উঠেছে। পোষাক শতছিন্ন ও ময়লা। এর ওপর আবার সঙ্গে যে মূল্যবান কিছু আছে লুকোবার জন্যে সাজ-পোষাক এমন করলুম যে দেখ্‌লেই মনে হয় আমরা দুজনে আধা-জংলী।

এবার সঙ্গে খাবার কিছু নেই। পথে দুদিন দুটো

পাখী শিকার করা গেল। একটা এমু, একটা ক্যাসোয়ারী। এমুর কয়েকটা ডিমও তখন সংগ্রহ করেছিলুম। ঐ পাহাড়গুলোর কাছ থেকে প্রায় আশী মাইল গিয়ে দেখলুম, টেলিগ্রাফের থাম বসানো হচ্ছে। সেই মজুরদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে আমরাও মজুর হয়ে গেলুম। সেখানে কিছুদিন কাজ করে এক কাবুলী উটওয়ালার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। সে ঐ পথে উট বেচতে যাচ্ছিল। তার উটে চড়ে আমরা পোর্ট ডারুইনে এসে পৌঁছলুম। মীর খাঁ সেখানে আমাদের দুজনেরই কতকগুলো পাথর বেশ চড়া দামে বিক্রী করলে। সেখানে দিন দুই থেকে আমরা দেশে রওনা হলুম। মীর খাঁ গেল বোম্বাই। ওখান থেকেই সে দেশে যাবে। আর আমি নামলুম এখানে—তারপর এই হোটেলে আপনাদের সঙ্গে দেখা—বলে সামন্ত চুপ্ করলেন।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ্। দূরে বন্দরের কোথায় যেন ঢং ঢং করে দুটো বাজ্‌ল। শব্দটা চারজনের কানে যেতেই সকলেই চমকে উঠলুম। তখনই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে শুতে গেলুম।

বিছানায় শুয়ে চারজনের কাছ থেকে শোনা গল্প চারিটির নানা ঘটনা মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা সুরু কোরে

## Art.

**Adam's Fifth Rib.**—*48 studies of female figures in nude: Size 10″X12½″ For artists as well as lovers of beauty it is a paradise ; your heart will leap up in admiration to look at the softness, clearness & the originality of composition of these life-like reproductions. It will set you seriously thinking whether photography is a craft or an art. For many years to come it will remain as a standard work in the collection of all artists ; by John Everard ;* Rs. 9/6/-

**Drawings of the Great Masters.**—A series of 5 Vols., each with text and 72 plates in collotype ; each 13/8/- ; (i) Drawings of The Early German Schools edited by Parker (ii) Do Early Flemish Schools edited by Poplem (iii) Duch Drawings of the 17th Century edited by Mellaart (iv) Flemish Drawings of The 17th Century edited by Machall-Viebrook (v) North Italian Drawings of the Quatro-Cento edited by Parker.

**Drawings of Antonio Canal, Called Canaletto** edited by Baron Von Hadelin ; 72 full-page plates ; Royal 4 to. ; Rs. 52/2/-

**Original Views of London** ( 25 plates with descriptive notes ; introduction by Beresford Chancellor : contains some very rare information ) by Th...

**The Light of Asia** ( 16 illus in colour ) by Sir Edwin Arnold Rs. 15/12/-

3. The following make charming gift books : all nicely printed and bound and with portrait of the writer

- (a) **The Complete Poetical Works of Elizabeth Barrett Browning.** Rs. 7/14/-
- (b) **Ivanhoe** by Scott. Rs 2/10/-
- (c) **Vanity Fair** by Thackeray, Rs. 2/10/-
- (d) **Jane Eyre** by Charlotte Bronte, Rs. 2/10/-
- (e) **American Notes** by Dickens Rs. 2/10/-
- (f) **Miscellaneous Papers & Mystery of Edwin Drood** by Dickens ; Rs. 2/10/-
- (g) **Lyrics of Ben Jonson & of Beaumont & Fletcher** edited by John Masefield, Re. 1/14/-
- (h) **Plays & Poems** by Christoher Marlowe Rs. 2/10/-
- (i) **Lyrical Ballads** by Wordsworth & Coleridge, edited by Hutchinson, Rs. 3/12/-

4. **Czar Feodor Ioannovitch** ( a drama in Verse ) by Tolstoi, Rs. 3/12/-
5. **Death of Ivan The Terrible** ( a drama in verse ) by Tolstoi, Rs. 3/12/-
6. **Gods Are Athirst** ( colloured frontispiece & 11 illus. in black & white ) by Anatole France, Rs. 12/-
7. **Memoirs of A Nun** ( translated with an introduction by Francis Birrell ) by Denis Diderot ; Rs. 7/14/-
8. **The Tragedy of Ah Qui** : and other modern Chinese Stories ( translated from the Chinese by Kyn Yn Yu & from the French by E. F. Mills) Rs. 4/8/-
9. **The Book of The Marvels of India** ( Arabian travellers' tale of the 10th Century, translated by Peter...

OF THE DAY

**[illegible] Is Not Enough** (Lectures delivered at [illegible] Institute Of International Relations) by Rap- [illegible] Zimmern, Dennery, Gooch. Attlee, Angell, D.l- [illegible] Phelan, Condliffe, Mac Iver, and Rex Robinson 6/6/-

**The Treaty of Versailles & After** by Lord Riddell Marquess Of Reading, Sir Norman Angell, Web- [illegible], Toynbee, Saurut, Von Rheinbaben, Davanzati and Holland 3/12/-

**The Burden of Plenty** by Brand, Dalton, Henderson, Hobson, Orage. Robbins. Salter and Wootton 3/6/-

**The Causes of War** by Rev. Inge, Lord Beaverbrook, Sir Austen Chamberlain Sir Norman Angel, Sir Josiah Stamp, Cole, Aldous Huxley anp Major Douglas. 2/10/-

**The Growth Of Fascism In Great Britain** (Introduction by Laski) by W A. Rudin 2/10/-

**Challenge to Democracy** by Delisle Burns 3/12/-

**The State In Theory & Practice** by Laski 5/10/-

## Science

[illegible] From the Star by George Hale, hony. director of Mt. Wilson Observatory, 6/-

Beyond The Milky Way by Do 4/14/-

Cosmic Evolution (scientific materialism and religious idealism are fundamentally incompatible) by John [illegible] Ph. D. [illegible]

## Games & Physical Culture.

1 **Books by Uncle Baby**—Care of Hair, Care of Teeth, Care of Eyes, Strengthen Wrists & Fingers, Strengthen Nerves, Strengthen The Back, Strengthen The Lungs Strengthen Heart, Cure Stuttering and Stammering, Cure Constipation, Cure Indigestion, Develop The Arm, Develop The Leg, Insomnia and Its Treatment, Varicose Veins and their Treatments, Keep Fit, Keep Liver Healthy, Put on Flesh, Reduce Weight, Physical Culture For Beginners Simple Diet, Improve Circulation, Everyday Ailments and Accidents, Knock-knees and Bow-legs.
Each As. 9 only. For a single book send -/10/3 in postage stamps, Postage free for Four copies at a time.

2. **My System** (120 illus.) by Muller, 2/10/-
3. Do for Ladies (160 illus.) by Do, 2/10/-
4. **Do for Children** (74 illus) by Do, 2/10/-
5. **My Breathing System** (52 illus) by Do, 2/10/-
6. **Daily 5 Minutes** (50 illus and 4 charts) by Do, 2/10/-
7. **Errors That Lose Decisions** (or blunders of boxers; 14 illus) by C. Rose. 1/2/-
8. **Tricks of Self-defence** (40 illus) by Col [illegible]. 1/2/-
9. **Tricks & Tests of Muscles** (64 illus) by the editor of "Health and Strength". 1/12/-
10. **Parallel Bar** (28 illus) by Staff-Sergt. Moss 1/2/-
11. **Horizontal Bar** (32 illus) by Do 1/2/-

*The following will be supplied less 25 % if your order reaches us before 30th April*

**1. Living Philosophies** ( Parsonal beliefs of Einstein, Inge, Adams, Krutch, Millikan, Draisser, Mumford, Russell Nansen, Jean, Belloc, Webb, Edman, Haldane, Deway, Wells, Menken, Peterkin, Babit & Hu, Shih , Portrait and biographical notes of every author ) Rs. 10/- **2. Contract Bridge Blue Book : 1933** by Culbertson Rs. **3. World's Best Essays** edited by Pritchard Rs 6/6,- **4 World's Best Poems** edited by Doren & Lapolla Rs, 6/6/- **5. Roosevelt & His America** by Bepnard Fay Rs 7,14/- **6. Student's Text Book of Astrology** by the editor of Mod rn Astrology 7/8/- **7. The Sixth Sense** ( a physical explanation, of clairvoyance Telepathy Hypnotism, Dreams etc ) by Joseph Sinel 4/8/- **8 Witch Hunting & Witch Trials** ( illustrated & indexed ) by L' Estrange Ewen 15/12/- **9. Isadora Duncan's Russian Days & Her Last years in France** Duncan & Mc Dougall Rs, 11/4/ **10. Divorce As I see it** by Bertrand Ruussell, H G, Wells, Warwick Deeping, Hurst, Andre Maurois, Rebecca West & Feuchtwanger 2/10/ **11 Sacred Fire** (a complete servey of sex in religion by Goldberg 18/12/-. **12. Case for Sterilization** ( is it permanent ? Will it improve the race ? Does it with normal sexual functions ? will it reduce insanity, degeneracy & feeble mindedness ? by Rs. 6/6/- **13 Economic & Social Aspects of Crime in India** by Bejoysankar Haikerwal ; by Radhakamal Mukerji Rs. 7/8/- **14 Modern Theories & Forms of Industrial Organization** by Rs. 1,12/-. **15. Revolt of The Masses** by Ortega Gassett Rs 3/12 - **18 Boxing As A Fine Art** by Carpenter 2/10/-. **19. Handbook of Institutions** for the scientific study of international relations League of Nations lications 2/10] **Business Books by** Herbert Casson (1) How to keep customers (2) What we Employees can do (3) How

[illegible] by Arthur Rackham, 4/8/-

Tom Brown's School Days (8 coloured plates by Laidlow) by Hughes, 4/8/-

The Life of St. Pauls for Young People (8 coloured plates by Moser) by Grierson, 4/8/-

The Water Babies abridged for boys & girls (8 coloured plates by Gatlish) by Kingsley. 4/8/-

The Vicar of Wakefield (8 coloured plates by Wright) by Goldsmith, 4/8/-

Midshipman Easy (8 coloured plates by Tawse) by Marryat, 4/8/-

## Games & Physical Culture.

Books by Uncle Bob—Care of Hair, Care of Teeth, Care of eyes, Strengthen Wrists & Fingers, Strengthen Nerves, Strengthen The Back, Strengthen The Lungs, Strengthen Heart, Cure stuttering and Stammering, Cure Constipation, Cure Indigestion, Develop The Arm, Develop The Leg, Insomnia and Its Treatment, Varicose Veins and their Treatments, Keep Fit, Keep liver Healthy, Put on Flesh, Reduce Weight, Physical Culture For Beginners, Simple Diet, Improve Circulation Everyday Ailments and Accidents, Knock-knees and Bow-legs.
Each As. 9 only. For a single book send -/10/3 in postage stamps, Postage free for Four copies at a time.

My System (120 illus. by Muller, 2/10/-

Do for Ladies (169 illus) by Do, 2/10/-

4. Do for Children (74 illus) by Do, 2/10

[illegible] The Complete Stunt Book (stunts and stunts for all occasions, social or domestic, 2nd edition) by Do, 4/8/-

## Fiction.

1. She Done Him Wrong by Mae West, 6/6/-
2. Grounds for Indecency by Milton Gropper and Edna Sherry, 6/6/-
3. Lady Gone Wild by Phyllis Demarest, 6/6/-
4. Indiscreet Confessions of a Nice Girl—anonymous, 6/-
5. Candy (a vivid and moving story of Negro life to-day on a plantation along the Savanah River in U. S. A.; 6 illus by Rockwell Kent) by L. M. Alexander; out of 1500 mss, it won the 3rd Dodd Mead Prize Novel competition of $ 10000, 7/8/-
6. Mammoth Mystery Book (The Hairy Arm, Blue Hand and The Sinister Man—3 complete novels in one by Edgar Wallace, 4/8/-
7. The Great Western Special (The Two Gun Man, The Coming of The Law & The Trail To Yesterday—3 complete novels in one) by Charles Seltzer, 4/8/-
8. The World's Great Detective Stories edited & compiled by Van Dine, 3/-
9. Favourite Novels of Rider Haggard (Cleopatra, She, King Solomons Mine, Allen Quatermain & Maiwa's Revenge—complete In one Vol.), 3/-
10. The Oppenheim Omnibus (Jeeneton & C...

## Unusual Interest.

1. A Narrative History of Aviation (50 illus.) by [illegible]ton, Rs. 9/6/-
2. A Marriage To India by Frieda Hauswirth ( Mrs Sarangadhar Das ) Rs. 12/-
3. The Magic & Mysteries of Mexico ( the Arcane secrets & occult love of the ancient Mexicans Mayas ; 16 illus. ) by Lewis Spense, Rs. 11/4/-
4. Seven Pillars of Wisdom by T. E. Lawrence ; Rs. 20/-
5. Paris is a Woman's Town (Oh, London is a man's town, There's power in the air , And Paris is a woman's town, with flowers in her hair ) by Helen Josephy & Mary McBride ; Rs. 9/-
6. A Lady who Loved Herself ( life of Madame Roland ) by Catharine Young, Rs. 12/-
7. Wine Women & Waltz ( romantic biography of Johann Strauss ) by David Ewen, Rs. 9/-
8. Autobiography of a Criminal ( thief, imposter, [illegible]ndler, Indian Doctor, traveller, revolutionary soldier & deserter and a complete amourist) by Henry Tufts, Rs 9/-
9. Harem Life ( the authoress, a Hungarian Countess born in Philadelphia married as his second wife Abbas Hilmi, the second Khedive of Egypt ) by Princess Djavidan Hanum, Rs. 10/8/-
10. Harun Al-Rashid ( the Lord of complete license ; 8 illus. ) by Gabriel Audiso, Rs. 10/8/-
11. A Gallery of Old Rogues ( for the love of women or the hatred of men they inscribed their names on the long & glamorous list of outlaws ) by Joseph Louis

[illegible] the Studio Ltd ) edited [illegible]

9. Modern Publicity [illegible] ( Published by [illegible] edited by Mercer & Gaunt [illegible]

## Reference Works.

1. Radio Encyclopaedia ( latest edition ) by G[illegible] back Rs. [illegible]
2. Origins & Meanings of Popular P[illegible] & Names ( with a dictionary of war slang [illegible] edition ) edited by Basil Hargrave Rs. [illegible]
3. Origins of Popular Superstitions, C[illegible] & Ceremonies ( latest edition ) edited by [illegible] Knowlson, Rs. [illegible]
4. Dictionary of Antiquities ( mythology [illegible] art & literature ; over 450 illus ; from the [illegible] of Dr. Oskar Seyffert ) edited and with additions [illegible] Henry Nettleship & J. E Sandys, Rs. [illegible]
5. Dictionary of Foreign Phrases & C[illegible] Quotations ( Latin, Greek, French, German, [illegible] Spanish & Portuguese ; with English translations [illegible] equivalents ; latest edition) edited by Percy Jones, [illegible]

## For Boys & Girls.

1. Wonder Tales of Past History ( [illegible] frontispiece & numerous illus ) by Robert Finch Rs. [illegible]
2. Wonder Tales of Great Explorers ( as [illegible] by Do. Rs. [illegible]
3. Wonder Tales of World Heroes ( as before ) by [illegible]

# MONEY-EARNING BOOKS

## INDIAN PERFUMES, ESSENCES AND HAIR OILS.

It deals elaborately with the possibility of perfumery [illegible], classification of materials, principles of manufacture of floral oils, extracts of flowers, essential oils, essences, [illegible], aromatic and toilet waters, hair oils, face cream, [illegible] oils, etc., together with many well-tried recipes

Price Rs. 1/8/-

## INDIAN TOBACCO AND ITS PREPARATIONS

[illegible] process and recipes for smoking preparations [illegible] Tobacco, Khambiras, Snuff, Surti, Zarda, Dokta, [illegible] will be found in this book with an exhaustive glossary [illegible] names. Possibilities of the industry is also [illegible]. Manufacture of Cigar and Biri is included.

Price Rs 1/8/-.

## INDEPENDENT CAREERS FOR THE YOUNG

Do not hang on the office for service Devote yourself [illegible] industry. The book will reveal to you the ways and [illegible] by which you will have plenty of earning occupa

Price Rs. 1/8/-.

## INDIAN PICKLES, CHUTNEYS AND MORABBAS

You can manufacture every one of them at your home and carry a business in your market The book contains [illegible] ingredients, spices used, preserving medium, curing

## MANUFACTURE OF SOAP

The book will greatly help you with various processes of manufacture, both cold and hot It elaborately deals on laundry soaps, Toilet soap, Textile and Dyer's Soap, Floating Soaps, Soap Powder, Medicated Soap, or other Soaps of every kind Over 200 pages

Price Rs. 1/8/-

## COTTON DYEING & PRINTING

Process of dyeing and printing cotton and cotton goods will be found in minute detail in it Indigenous and modern methods are both treated Chemicals of all variety, [illegible] and dyestuff will also be found printed there

Price Rs. 1/8/-

## HOME INDUSTRIES

Many practical ideas for the Manufacture of Battery, Biscuit, Cakes, Vinegar, Fruit Juices, Vermilion, Shellac, Lac Bangle, Catechu, Fire Works will be found in the book

Price Rs. 1/8/-

## PROSPECTIVE INDUSTRIES

Discusses Manufacture of Boot Polishes—Manufacture of Depilatories—Tambul Bilar—Hair Dyes—Dental Preparations—Toilet Preparations—Cements and Glass, Rubber, etc. —Metal Polish—Incense Sticks—Crayons—Medical Preparations etc

Price Rs. 1/8/-

## DENTAL PREPARATIONS.

A comprehensive guide for those who intend to take up the manufacture of tooth powders, tooth pastes, tooth creams, mouth washes, medicinal preparations for the teeth, etc. The modern methods of manipulation have been incorporated in

It is an exposition of Methods which build up Retail Trade. It has 17 chapters as (1) Peculiarities of the Trade, (2) Key to Retail Selling, (3) Starting a Shop, (4) Policy behind a Store, (5) How to Keep the Store, (6) How to Display, (7) Selling Methods, (8) How to Increase Turnover, (9) Cash or Credit Business, (10) Handling Complaints, (11) Collecting Dues, (12) Stock Taking, (13) Buying Methods, (14) Prices and Profits, (15) Keeping of Accounts, (16) Packing and Delivery, (17) Secrets of Success. Nicely printed. Card Board Bound.

Price Re. 1/-

## CHEMICAL INDUSTRIES OF INDIA

CONTENTS:—Possibilities of Chemical Industries in India, Raw Materials, General Processes, Sulphuric Acid and Sulphates, Hydrochloric Acid, Zinc and other Chlorides, Potassium Chlorate, Chlorine, Bleaching Powder, Nitric Acid, Ammonia and Ammonium Compounds, Tannic and Gallic Acid, Citric Acid, Acetic Acid, Tartaric Acid, Carbonic Acid, Hydrogen Peroxide, Sodium Silicate, Alum, White Lead, Zinc Oxide, Manganese Dioxide, Ferrocyanides. *Well-printed in Antique Paper, Bound in Card Board Cover.*

Price Re. 1/8/-

## NEW CUSTOMERS: HOW TO CREATE—HOW TO HOLD.

By K. M. Banerjee. Learn the modern methods of attracting new customers, learn to know the purchasing minds, learn the secret of human needs and how to develop them, find the capacity of the purchasers, learn the customer-winning talks. This book will give you all the modern new ideas for creating new customers and developing new business.

Price R. 2/-

## PROBASHI BOOK STALL.

Extraction of Cane Juice, Chemistry of Cane Juice, Small-scale Sugar Manufacture, The Factory, Methods of Juice Clarification, Curing and Refining of Sugar, White Sugar Manufacture, Trade in Sugar, Out-look in India and abroad.

Over 300 pages, fully illustrated, neatly printed and cloth bound.

Price Re. [illegible]

## MANUFACTURE OF RUBBER GOODS.

Reveals the secrets of manufacturing various rubber goods such as rubber toys, rubber baloons, rubber erasers, [illegible] shoes, rubber sheets, rubber tubes, rubber tyres, rubber pencil tips, types, etc., rubber stamps, rubber solution.

Price Re. [illegible]

## MECHANICAL INDUSTRIES.

There are many marketable articles which one can manufacture by help of small machines. This book [illegible] number of such manufactures with detailed descriptions and illustrations of machines.

In the contents there are chapters on:—Coming Machine Age—Sheet Metal Articles—Safety Razor Blades—Wire and its Manufacture—Barbed Wire—Wire Mattresses—Wire Nails—Safety Pin—Hair Pin—Paper Clip—Brass Hinges—Brass Tubes—German Silver Spoons and Forks—Aluminium [illegible]—Combs—Motor Car Mudguards—Barre[illegible]—Foot Rule—Buckets, etc.

Price Re. [illegible]

## MANUFACTURE OF CONFECTIONERY

A handbook comprising detailed description of the manufacture of foreign and Indian Confections. T[illegible] of Contents: Introduction—Raw Materials—Factory Eq[illegible]ents—Manipulations—Fondants—Drops and Lozenges—[illegible] el—Toffee—[illegible] Chocolate [illegible] Jams and [illegible] Preserved Fruits—Indian Confections, etc.

[illegible]

14. **True Tales of Kidnapping** (in America China & Mexico, upto the Lindbergh Baby case) by Mansfield, Rs 7/8/-

15. **History of Piracy** (4 maps & 17 illus) by Philip Gosse, Rs 10/8/-

16. **Behind Moroccan Walls** (wife of a French officer shows cross-sections of the lives of native Moroccan women—slaves, wives, widows & co-wive—each story is rigorously true, 30 unique pictures which alone are worth the price) by Henriette Celarie, Rs 15/-

## Annuals & Yea Books.

1. **Brown's Boy Scout Diary** (a complete handbook as well as a diary) - 12/
2. **Brown's Girl Guide Diary** (as before) -/12 -
3. **The Badminton : 1936** (a register of sporting & society fixtures & diary. 42nd annual publication, should remain in the pocket of every race lover 2 Vols) edited by E. Dyer, Rs 3/12/.
4. **Ayre's LawnTennis Almanack, 1935** (88th year of issue) edited by Wallis Myers, Rs 3/12 -
5. **The Airmen's Year Book & Light Aeroplane Manual 1935** (published under the authority of the Royal Aero Club of the United Kingdom) edited by Squadron Leader C G Burge, Rs 3/12
6. **Daily Mail Year Book 1936** (36th year) edited by David Williamson, As. -/12/-

6 **Andersen's Fairy Tales with 4 coloured illustrations,** Re 1/14[illegible]

7, **Buffalo Bill, Chief of Scouts** (coloured frontispiece & numerous full page pen drawings) by Win[illegible] Wilson, Re 1[illegible]

8 **Stories From Arabian Nights** (4 coloured [illegible] 6 full page pen drawings) by Agnes Pape, Re, 1/[illegible]

9. **Lorna Doone ' told in pictures** (170 dra[illegible] and a coloured frontispiece) by Do, Re. 1[illegible]

10. **Robinson Crusoe** : told in pictures (207 drawings [illegible] a coloured frontispiece) by Do Re. 1[illegible]

11 **Alice's Adventure in Wonder land** (6 colou[illegible] illus) by Lewis Carroll, Re. 1[illegible]

12, **Robinhood & His Merry Men** (4 coloured illus[illegible] retold by Sara Sterling, Re. 1/[illegible]

13 **Boys Adventure Book** (4 coloured and numerou[illegible] other illus) by Bridges, Lyons and Capt. Maclure. Rs. 5/10[illegible]

14. **Bible Stories For Young Folk** (numerous illus[illegible] trations in the text by Rev Crowlsmith, 1[illegible]

15. **A Christmas Carol** (8 illus. in colour & 15 illus. [illegible] black and white by Arthur Rackham) by Dickens, [illegible]

16. **Aesop's Fables** (8 illus. in colour and 51 in [illegible] and white by Do.) translated by Vernon Jones with [illegible] introduction by Chesterton, [illegible]